# নিলোখেরি

এস·কে·দে



মহাভারতের যুদ্ধ ভারতবর্ষের জীবনের এক আশ্চর্য প্রতীক এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের অতি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। বোধ হয় এই সত্যের ইঙ্গিতই আছে যে কেবলমাত্র দুঃখকষ্ট আর বেদনার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন এক অর্থপূর্ণ জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হতে পারি।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ঘটনা আজ হলো এই যে, কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোগ্রাম, কো-অপারেটিভ ইকনমিক অর্গানাইজেশন এবং পঞ্চায়েতী রাজের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে মহাভারতের স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রে। এই কুরুক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুরা দেশ-বিভাগের পর হাজারে হাজারে এসে পড়লো। আবর্জনার জঞ্জালস্তূপের মধ্য থেকে নতুন জীবনের আগুন জলে উঠলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষদের হাতে, সেই মশালের আলোয় জলে উঠলো আর একটি নবজীবনকেন্দ্র—নীলোখেরি।

১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষের বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার কয়েকটি কেন্দ্র চতুর্দিকের অন্ধকারের মধ্যে আলোর ধারাটিকে ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। যতদিন না সমস্ত দেশ আলোকিত হবে এই কেন্দ্রগুলিকে বাড়িয়ে চলতে হবে। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে নীলোখেরি—ভারত আর ভারতের বাইরে যার নাম ছড়িয়ে গেছে।"

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে প্রথম দিন থেকে কুরুক্ষেত্রের ধূলিমলিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই আলোকশিখাটিকে লালন করে চলেছেন—সেই শিখা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গ্রামকে আলোর আভায় রঞ্জিত করেছে। এই গ্রন্থে সেই প্রথম পথচলার দিনগুলির ব্যর্থতা ও আত্মদান এবং জীবনগঠনের পুণ্যবাসনায় যে নাটকীয়তা অর্জন করেছিল তারই কথা বলা হয়েছে।

সমসাময়িককালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নীলো-খেরি একটি উজ্জ্বল নাম।

954

GOVT. TRAINING COLLEGE
2998
HOOGHLY
10.9.64

# নিলোখেরি

GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY

# নিলোখেরি

GOVT. TRAINING COLLEGE
2998
HOOGHLY
10.9.64
Extension Services Dept

এস. কে. দে

For FAVOUR OF REVIEW.

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
২১১।১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শাখা ঃ
৪৪, জনস্টনগঞ্জ
এলাহাবাদ-৩

অশোক রাজপথ
পাটনা-৪

প্রথম মুদ্রণ জুন, ১৯৬৪

মূল্য ৫'০০

Acc. no. - 15138

জানকীনাথ বসু কর্তৃক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপরিমলকুমার বসু কর্তৃক বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

B3
1019
GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
10.9.64
Extension Services Dept.

# উৎসর্গ

[illegible]লাখেরির সেই অগণিত সৈনিকদের—জলাভূমিতে তাদের বাস। ওরা কাজ করেছে বছরের পর বছর—মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, গায়ের রক্ত জল ক'রেছে—বিগত দিনের ক্লান্ত জীবনের অবসানে আগামী কালের নতুন প্রভাত যেন কলঙ্কমুক্ত হ'য়ে দেখা দেয়—সেই প্রতীক্ষায়।

GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
Extension Service Dept.

# ভূমিকা

'নিলোখেরি' প্রথম প্রেমের এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। দিল্লী থেকে আম্বালা যেতে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পঁচাশীতম মাইল পোস্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট এক উপনগরী। 'নিলোখেরি' সেই উপনগরী গঠনের গল্প। বলার মত কথা, তাই বলছি। লেখকের প্রথম প্রেমের কাহিনী এই নিলোখেরি। সেই কৌমার্য প্রেমের ফল একটি নির্দিষ্ট সমাজ জীবনের মাঝে আজও জীবন্ত হ'য়ে আছে। স্বাধীনতার দুর্বার ভার বহনে, খণ্ড ছিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের কয়েক সহস্রের নতুন 'আশ্রয়' যোগাবার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছিল এই নিলোখেরি। একটি কবিতা যেন মূর্ত হ'য়েছিল কঠিন গদ্যের ছন্দে। এর আদি কাহিনী ও ধারাবাহিক রূপটি এমনিই যে আমার নিজের কথায় না বলে এই অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা গেল না। ভারতবর্ষে সেদিন যে সব বিভিন্নমুখী শক্তির প্রতিঘাত চলেছিলো এই কাহিনীর রচয়িতা সেই গতিমুখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিল। মানুষটি একটি বাঁশীতে পর্যবসিত হ'য়েছিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা অদৃশ্যশক্তিতে এই "বংশ" খণ্ডকে মুখরিত করে তুলুন, এই ছিল তার আশা ও প্রার্থনা। বহুদিনের পুরোনো এই গল্প প্রায় একদশকের পর ঠাণ্ডা ঘর থেকে টেনে বার ক'রেছি। সৃষ্টির সেই আনন্দ ও রোমাঞ্চ যে আমার নিজের কথায় না বলে মূর্ত ক'রে তোলা যায় না। পাঠক তাই ক্ষমা করবেন।

তখন ১৯৪০ এর মাঝামাঝি। স্বাধীনতা প্রায় এলো ব'লে। আমার মধ্যে কি যেন একটা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠছে সেদিন। তবু টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে ওঠেনি। আমি ছটফট করেছি। ভিতর থেকে কি যেন একটা নিস্পিষ্ট ক'রে তুলেছে আমাকে। হাতছানি দিয়ে বলেছে যে, যে জগৎকে আমি এতদিন ধ'রে চিনেছি আর জেনেছি সে জগৎ বুঝি চিরবিদায় নেবে এবার। সে দুর্বিপাক রোধ ক'রতে হ'লে নতুন পৃথিবীর উদ্ভব ঘটাতে হবে। নারী যখন তার প্রথম প্রসব সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়—ব্যাপারটা কি ঘটেছে ঠিক করে বুঝি সে বুঝে উঠতে পারে না। মনে হয় তার শুধু, যে বিরাট এক

আলোড়ন চ'লেছে তার সমস্ত সত্বার মধ্যে যাকে প্রসবিত করতে হ'বে।— এই তার ভাবনা। অবস্থা আমার সেই প্রথমার মত। নৈসর্গিক প্রসাদ গ্রহণ করার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা ক'রেছি সেদিন। এই মনস্তত্ত্ব-মূলক মুহূর্তে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর লাল্ নেহরুর এক আবেদন আমার কানে এসে পৌচেছিলো: ভারতবর্ষের সৌধ গঠনের জন্য ডাক দিয়েছেন তিনি।

আমার পরিচয় ও অভিজ্ঞতার এক বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে আমি কোনও চাকুরী বা বিশেষ পদের প্রার্থী নই। সাধারণতঃ লোকের যে ধরনের পদাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে মোটামুটিভাবে তা সবই আমার পূরণ হয়েছিল। পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সংস্থা ভারত, বর্মা ও সিংহল শাখার ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার তখন আমি। আমার নিজস্ব ও স্বীয় পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালাবার মত প্রায় দশ বছরের পাথেয়র বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছিলাম। চাষীর ছেলের কৌমার্যতেজকে প্রকাশিত ক'রতে হবে, এমনি একটি সুযোগ তখন খুঁজছিলাম আমি। যদিও ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বিদ্যালাভের সুযোগ আমার হ'য়েছিল, তবু গ্রাম পুনর্গঠনের কাজেই হাত দিতে আমি অধিকতর আগ্রহী, এই মর্মে জানিয়ে দিলাম।

অনেক চেষ্টা করেও পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে কোন জবাব পেলাম না। তবু হার কিছুতেই মানবো না,—এই হলো আমার সঙ্কল্প। প্রায় সব কজন নেতা, যাঁদের যাঁদের কথা সেদিন মনে ক'রতে পেরেছি, তাঁদের প্রত্যেকের দরজায় গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে হানা দিলাম। কিন্তু হ'লো না কিছুই। আজকে যখন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে সেদিনকার সেই দিনগুলোর রূপ আমাদের নেতাদের কাছে কি জটিলই না ছিল। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে সেদিন তাঁরা ব্যস্ত। কিন্তু আমি তখন, নিজেকে নিয়ে, যে আরো ব্যস্ত। ধৈর্য নেই আমার। ভীষণ রেগে গেলাম। ভাবলাম যে দেশে যেচে কাজ করতে চাইলে, আর সে কাজের বদলে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না থাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না, সে দেশের অবস্থা নিশ্চয়ই সঙ্গীন, আর আরো সঙ্গীনতর

হ'তে বেশি দেরি নেই। আমি যেন নিজের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত এক জীব। কিন্তু যেখানে তখন দাঁড়িয়েছিলাম তাতে নিজের বা অন্যের সঙ্গে লড়াই ক'রেও এ আক্রোশ ঝেড়ে ফেলার উপায় পাইনি কোন। দেখতে ছোট্টখাট্ট হলেও অনন্যা ও দৃঢ়া আমার স্ত্রী যতদিন না নিজের সঙ্গে আমার এই লড়াই শেষ হয় ততদিন আমাদের পাঁচজন নাবালক সন্তানদের দেখাশুনার ভার তিনি নিজের উপর স্বেচ্ছায় তুলে নিতে রাজী হ'লেন।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল। স্বাধীনতা এলো। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস হলো মুখরিত। স্ত্রী, পুরুষ, বয়স নির্বিশেষে, সকলেই উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল সেদিন। স্মরণীয় সে মধ্যরাত্রে ত্রিবর্ণ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের স্থান গ্রহণ ক'রলো। রেলগাড়ি, বাস, পথচারী যানবাহন কোনটায় আর ঠাঁই নেই। উৎসব সাজে সজ্জিত পথচারীরা বড় রাস্তার ফুটপাতগুলি ভ'রে ফেললেন। বাতাসেও যেন মুক্তির আশ্বাস। মালাবার পর্বতের চূড়া থেকে সমস্ত বম্বে শহরটাকেই সেদিন এক আলোকময় উৎসবধারার মত দেখাচ্ছিল। পুরোনো ভারত মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিন আমি দেখেছি। দেখেছি, নতুন ভারতবর্ষের জন্মগ্রহণের বেদনার্ত মুহূর্ত। আমার উপশিরায় অদ্ভুত আনন্দে রক্ত যেন নৃত্য ক'রে উঠেছে। বিদ্যুতের মত মাথায় এসেছে এই কথা, যে এই আবর্তনীতে আমার কিছু করণীয় আছে। জেনেছি যে যদি আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে তা থেকে একটা গভর্ণমেণ্ট তো তুচ্ছ, স্বয়ং ভগবানও ঠেকাতে পারবেন না আমাকে। যদি শাসনযন্ত্র প্রতিরোধ জানায় সেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে শহীদ হ'তে হবে। পিছনে ফেলে আসা সাঁকো তাই ভেঙ্গে দিলাম, পুড়িয়ে দিলাম পার হবার তরী। আত্মজদের ফেলে এলাম পিছনে। উর্ধ্বশ্বাসে এসে পৌছালাম দিল্লীতে—নতুন রাজধানীতে হাজির হ'লো ঝলসিত পৃথিবী থেকে নিষ্কাসিত আরো একটি ভবঘুরে।

কুরুক্ষেত্র রেফিউজি ক্যাম্পে তখন উদ্বাস্তুরা সারি দিয়ে পিল পিল ক'রে হাজির হ'চ্ছে। পুনর্বাসন দপ্তরকে জানালুম এই ক্যাম্পে শ্রমদান ক'রতে আমি উৎসুক। কোন জবাব পেলাম না। ভারতের প্রথম পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুত নিয়োগীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় ছিল না। তাঁর এক ডাক্তার আত্মীয়কে আমি জানতাম। আমার বন্ধু মারফৎ আমার সব কথা শ্রীনিয়োগীকে আগেভাগে জানানো গেল। আর দিল্লীতে

লিপিবদ্ধ ক'রে ফেলব। অমূল্য সেই অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ একটা ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাকে নিঃশেষিত হ'তে দেওয়া উচিত হবে না। এ কাহিনী এত শীঘ্র প্রকাশিত হবে তা ভাবিনি। কিন্তু তারপর আরো বহু কিছু ঘটে গেছে, আর যতই দিন গেছে নিশ্চিত ভাবে মনে হ'য়েছে যে "নিলোখেরি" দেশকে অনেক কিছু দিতে পারে, দেওয়ার আছে। তা যদি নাও বা হয়—এই পরীক্ষা তো আমি জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থেই ক'রেছিলাম। এর পরিণতি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফল একলা ভোগ করার কোন দাবি আমার নেই। বাচনশক্তির গুণাগুণ বিচার না ক'রেই এ কাহিনী আজ সকলের সামনে তাই উপস্থিত ক'রে দিলাম। কাহিনী এলো পাঠকের দরবারে।

নতুন দিল্লী

**এস, কে, দে**

# সূচীপত্র



## পরিশিষ্ট

আসার পরেই তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেরও বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। —"কি কাজ ক'রতে চান আপনি ?" "যা এখনই দিতে পারেন। রাধুনী বামুন থেকে শাসন ব্যবস্থাপকের কাজ—সব কিছু ক'রতেই প্রস্তুত আমি। আমার কর্মদক্ষতা আছে, আছে সততা ও বুদ্ধি। এক চাষী পরিবারের প্রথম সন্তান আমি। মাত্র ছয় একর জমি থেকে এই পরিবারের কুড়িজন সদস্যের জীবননির্বাহ হ'য়েছে একদিন। আমার সব শিক্ষা ও আজকের যা কিছু পরিণতি তা সবই স্বীয় চেষ্টার ফল। যে কাজে আজ পর্যন্ত হাত দিয়েছি মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করেছি তাতে। পরীক্ষা ক'রে দেখুন আমাকে। এই চাই।"

"এই নতুন পথে পা বাড়াচ্ছেন আপনার স্ত্রীর সম্মতি পেয়েছেন ?"—মিঃ নিয়োগী এইবার প্রশ্ন ক'রলেন।

বললাম "পেয়েছি।" আর কোন কথা হ'লো না। নিয়োগী জানালেন যে তিনি তাঁর দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারীকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন। আগামী সোমবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

মাটির ওপর সমাজবাদী এক দ্বীপ গঠনের পরীক্ষানিরীক্ষার কাহিনীর ইতিহাস এই নিলোখেরি। সহস্র সহস্র উদ্বাস্তুরা সেদিন ভীড় ক'রে এসেছে, তাদের জন্য চাই নিশ্চিন্ত আবাস। তাদের নতুন ক'রে অঙ্গীভূত ক'রে নিতে হবে, এক নতুন দেশের এক নতুন সমাজে। সামূহিক বিকাশ আন্দোলনের জীবন্ত এক পরীক্ষা, আর সৃষ্টির এই তো সুযোগ। আমার মধ্যেকার যা কিছু উত্তেজনা ভিতর থেকে আমাকে পীড়িত ক'রে তুলেছিল তাকে কাজে খাটাতে হবে এইখানে। যে সব অগণ্য ভাবধারাকে পণ্ডিত নেহরু সেদিন মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখবার সুযোগ এসেছে আমার। শুরু হ'য়ে গেল পরীক্ষা মূলক এই আন্দোলন। কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম আনবিক যুগে মাটির উপর দ্বীপ গঠন সম্ভব হ'তে পারে না। সামূহিক বিকাশ, সর্বোদয় আর সমাজবাদী গঠন একই ভাবের বিভিন্ন বর্ণনামাত্র। এদের রূপ যদি মূর্ত ক'রে তুলতে হয় তাহলে সমস্ত দেশে—এমন কি, সমস্ত জগৎ জুড়ে তাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে হবে। নিলোখেরির সেই প্রথম পরীক্ষাগার থেকে জন্ম হ'লো সামূহিক বিকাশ আন্দোলনের—আজ যা সমস্ত দেশ জুড়ে

সঞ্চালিত হ'চ্ছে। ক্ষুদ্রাকারে সেই কাহিনী বর্ণনা করার চেষ্টা ক'রেছি 'নিলোখেরি' নামক এই বইতে।

পার্থিব এই শরীরটাকে জন্মাবধি কোনও রকম দয়া বা মমতা প্রদর্শন ক'রতে পারিনি। পূর্ব পাকিস্তানের অখ্যাত ও অজ্ঞাত এক গ্রামে তার জন্ম হ'য়েছিল। সেদিন সে গ্রামে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্যতম আনুষঙ্গিকটিরও সন্ধান পাওয়া যেত না। না খেয়ে ক্ষুধার্ত আমি বারো মাইল পথ পার হ'য়ে ইস্কুলে গিয়েছি। ম্যালেরিয়া ও আমাশাকে ক'রেছি নিত্যসঙ্গী। আমার জৈবিক যন্ত্রটার উপরে এ সবকিছুরই চিহ্ন র'য়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে লোক ছিল কুড়ি জন, জমি ছিল ছ'একর। বহুশত বৎসরের পুষ্টি—বুভুক্ষু সেই জমি শত বরষায় বিক্ষত, তা থেকে যা পাওয়া যেত তা ছিল অতীব সামান্য। পরে যখন বড় হলাম, সামর্থ্য এল হাতে, তখন অতীত ক্লেশ ও বুভুক্ষার শোধ তোলার জন্য যেন চরমে উঠেছি আবার অন্যভাবে। তার চিহ্নও তো এই শরীরে থেকে গেল। এরপর এসেছে নিলোখেরির প্রচণ্ড পাঁচটা বছর। নিজের উপরে লোক যা কিছু অত্যাচার ক'রতে পারে তা সবকিছুই ক'রেছি। কমিউনিটি প্রোজেক্ট আন্দোলনের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হবার পরেও সে অত্যাচার থামেনি। স্বাভাবিক 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়তে হ'য়েছে আমাকে। সেও বড় সহজ সাধ্য ছিল না!

শরীর প্রতিবাদ করেছে তবু তার উপর অত্যাচার বন্ধ হয়নি। এর দারুণ ফল এলো ১৯৫৯ সালে—হৃদরোগের আক্রমণে। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে শুয়েছিলাম। তখন প্রথম হঠাৎ যেন বুঝলাম, দেহটা আমার অবিনশ্বর নয়। ফিরোজ গান্ধী এমনি ভাবেই এই হাসপাতালে এসেছিলেন আমার আগে। আমি বেরোবার পর সেখানে ভর্তি হলেন শ্রীযুত পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। এমনি কত আঘাত তাঁদের উপর দিয়েও গেছে। আজ তাঁরা দুজনেই নেই, আমি আছি। কিন্তু হৃদয় নামক যন্ত্রটা নিয়ে আর খেলা করা যায় না। আমার কাজ আর আমার স্বভাব এই দুটোই এমনি, যে ক্ষয়িষ্ণু হৃদয় যন্ত্রটাকে সবল ক'রে তোলার জন্যে তার যে সেবা পরিচর্যার প্রয়োজনে তা কখনই ক'রে উঠতে পারবো ব'লে মনে হয় না। তাই যেদিন পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের মৃত্যু হ'লো সেই দিনই ঠিক ক'রলাম যে নিলোখেরির কাহিনী, সেখানকার আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তা আমি

লিপিবদ্ধ ক'রে ফেলব। অমূল্য সেই অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ একটা ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাকে নিঃশেষিত হ'তে দেওয়া উচিত হবে না। এ কাহিনী এত শীঘ্র প্রকাশিত হবে তা ভাবিনি। কিন্তু তারপর আরো বহু কিছু ঘটে গেছে, আর যতই দিন গেছে নিশ্চিত ভাবে মনে হ'য়েছে যে "নিলোখেরি" দেশকে অনেক কিছু দিতে পারে, দেওয়ার আছে। তা যদি নাও বা হয়—এই পরীক্ষা তো আমি জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থেই ক'রেছিলাম। এর পরিণতি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফল একলা ভোগ করার কোন দাবি আমার নেই। বাচনশক্তির গুণাগুণ বিচার না ক'রেই এ কাহিনী আজ সকলের সামনে তাই উপস্থিত ক'রে দিলাম। কাহিনী এলো পাঠকের দরবারে।

নতুন দিল্লী

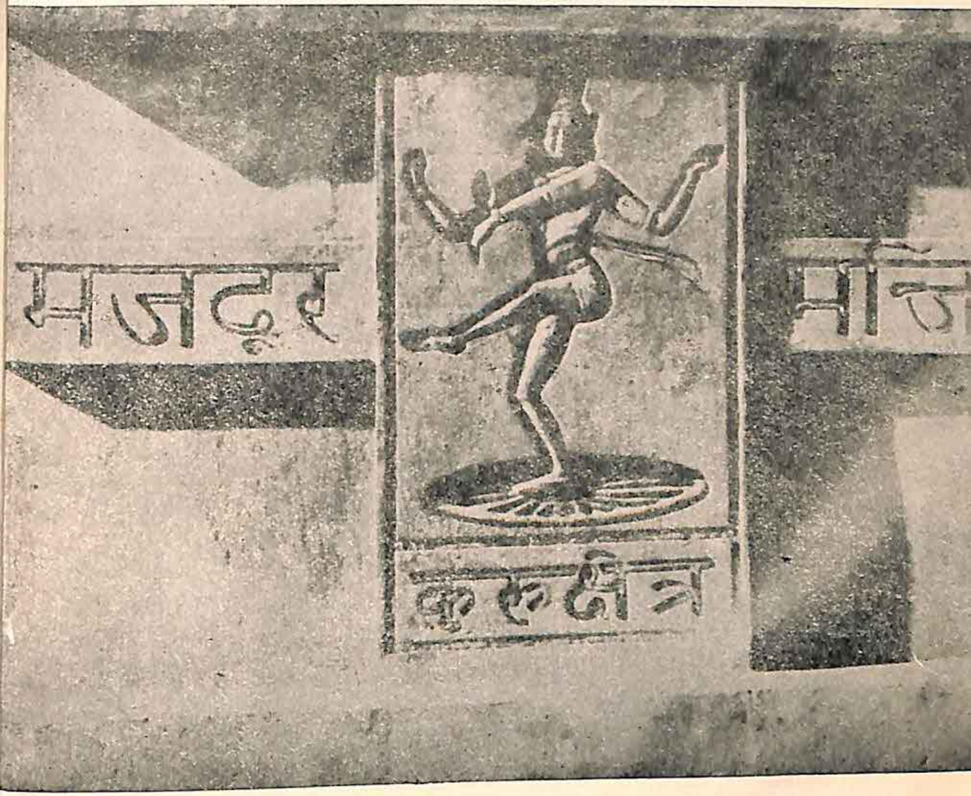
**এস, কে, দে**

# সূচীপত্র



## পরিশিষ্ট

---




নটরাজ শিব—মজদুর মঞ্জিলের প্রতীক

GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
Extension Services

## ॥ এক ঝলক দৃষ্টি ॥

"কোথায় আমার বাড়ি ?" জিজ্ঞাসা ক'রে শিশু। পিতা স্তব্ধ। দৃষ্টি তার ছুঁয়ে যায় দূর দিগন্ত, পার হ'য়ে যায় নীলাকাশ। জঙ্গম তারকারাশি পার হ'য়ে দৃষ্টি তাঁর চিন্তা জগতে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ে। কোথায় আমার বাড়ি—তার প্রতিধ্বনি উঠেছে বিশ্বে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কত শতকের বিস্মৃতিতে লুপ্ত কুরুক্ষেত্রে লড়াই-এর দৃশ্য আবার দেখা যায়। সমূলে উৎপাটিত নোঙোর ছেঁড়া কত পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুরা চুপ ক'রে সহ্য করে—ক্ষয় হ'য়ে যায়। "কোথায় আমার বাড়ি"—আবার সেই প্রশ্ন। বহু গণ্ডোগোলের মধ্য থেকে হঠাৎ ফুটে ওঠে একটা চাপা স্বর—"বাড়ি এইখানে। নয়তো নেই।"—সে কথা শুনেছে মাত্র কয়েকজন। যারা শুনেছে তারা দৌড়েছে—ছুটেছে, যতক্ষণ না পৌছে গেছে নিলোখেরি। সেখানে জলাভূমিতে মিশে গেছে সেই স্বর।

গ্রীষ্মের লু, ধূলো-বালি আর কাদা। শীতের ঝড়ো বাতাস। এরা সবে মিলে বনভূমিতে নিল দীক্ষা। ঘর থেকে বিচ্যুত হ'য়েছে বহুদিন। আবার এক ঝলকে দেখলো যেন সেই ঘর। সৃষ্টি ক'রতে হবে সেই ঘরের। আবার তাই শুরু হ'য়ে যায় পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু সকল মানুষের মিলিত পেশী আন্দোলন ও সৃষ্টি নৃত্য। লড়াই ও হত্যায় খণ্ড ছিন্ন পৃথিবীকে কুরুক্ষেত্র জোগালো বুঝি পরম জবাব :—"মজদুর মঞ্জিল"। সেই স্বপ্ন, মঞ্জিলের স্বপ্ন—পূর্ণ করার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা এই নিলোখেরি। ছন্দবদ্ধ বাতাসের শণশণ গান রূপায়িত হয়েছে এখানে নিলোখেরিতে।

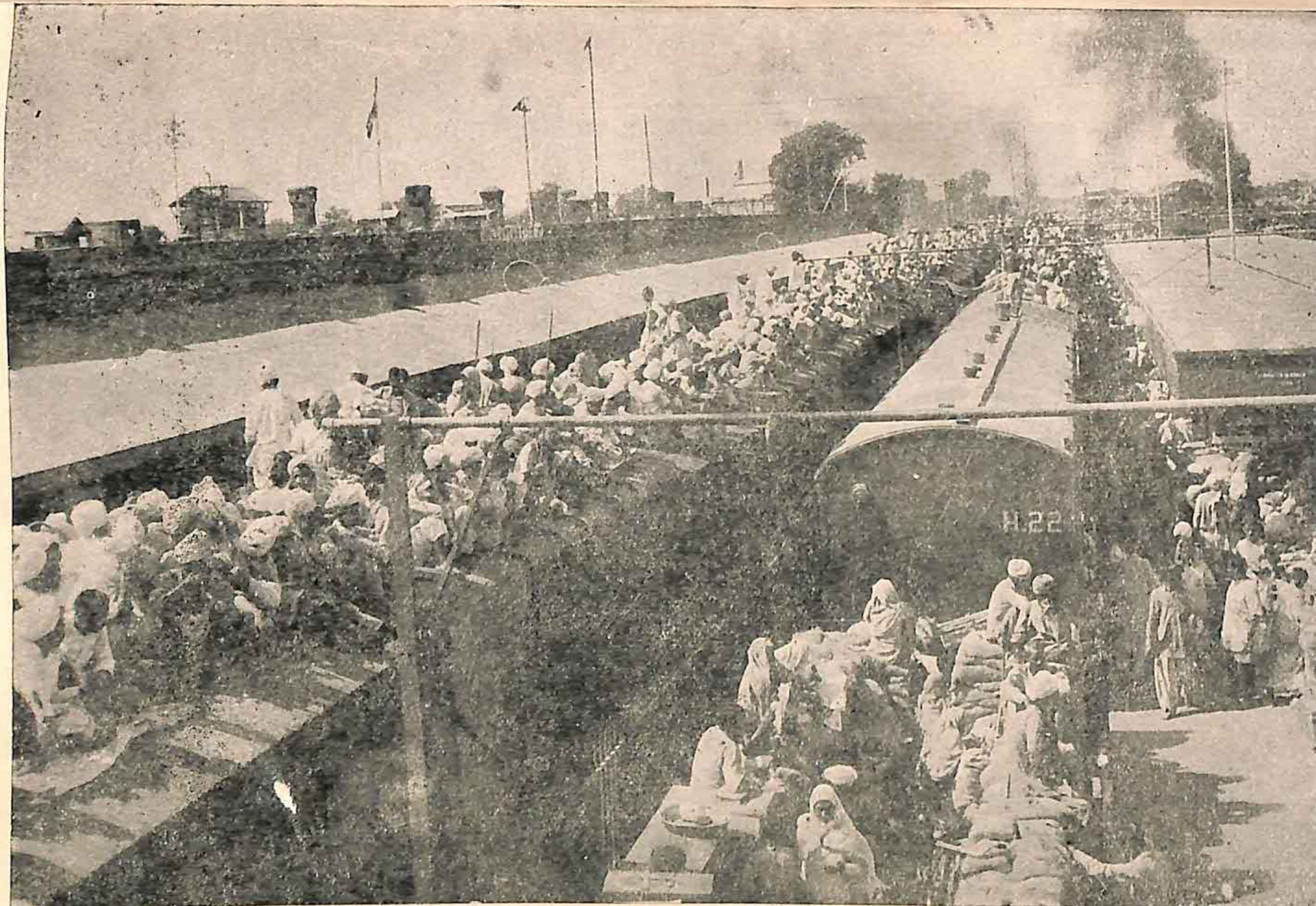
## ॥ স্বাধীনতা—তার ঠিক পরেই ॥

ভাগ হ'য়ে গেল দেশ। একটা জৈব যন্ত্র কত শত বছর ধ'রে এক ছিল। কুঠারের একটা আঘাতে আজ সে দুটুকরো হ'য়ে গেল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, বিদেশী শাসকরা ভাল ক'রেই লালন ক'রেছিলেন। এতদিনে তার একটা নতুন প্রকাশের পথ জুটলো। নবগঠিত দুই ডোমিনিয়নে শুরু হলো হিন্দুমুসলমানের খাওয়া-খাইয়ি। সেদিন মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি কালোযুগ শুরু হবার আগেই দিগন্তে নতুন মেঘের আভাস যেন পরিষ্কার! প্রায় পঞ্চাশ বছরের কত রক্ত কত অশ্রু দিয়ে অর্জিত বিজয়ের ফল সেও বুঝি যায় যায়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সম্মিলিত যত জনসংখ্যা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক লোক এই দুই দেশে সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে গেল। তাদের চাই নতুন আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ। আমাদের নেতাদের শাসনযন্ত্র চালনার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। একটা পুরো উপমহাদেশে সুশৃঙ্খল পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা তো ছিলই না। জনতার সম্মিলিত ক্রোধকে অহিংস আন্দোলনের ভিত্তিতে ধূমায়িত ক'রে সশস্ত্র শত্রুকে পরাভূত করার শিক্ষাটা তাঁরা ভালো ভাবেই পেয়েছিলেন। সেদিনকার শাসনযন্ত্রটার পারদর্শিতা ছিল অন্যদিকে কি ক'রে জনগণকে শোষণ করা যায় আর বেটন দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় তাদের, সেই কাজে। দেশের লোক ও দেশের শাসন সংস্থার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সেদিন তাই পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। বিদেশী শাসকরা তো গদি ছেড়ে দিলেন। ক্ষমতা এসে প'ড়লো আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের হাতে। কিন্তু তাঁদের কাজ ক'রতে হ'লে, এই কাজে দক্ষ একটা শাসনযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেদিন। শুধু শূন্যে তো তাঁরা কাজ ক'রতে পারেন না। গণ-তন্ত্রবাদকে চালু হবার সুযোগ দেবার জন্যে শাসনযন্ত্রটার মূল উৎসগুলিতে সেদিন তাই বহু লোকের প্রয়োজন। যে সব ইংরেজ অফিসাররা চ'লে গেলেন সেদিন, তাঁদের জায়গায় লোক চাই। রাতারাতি তাই অনেকের প্রমোশন হলো। এমনি ওঠা-ওঠি হলে মর্যাদা বাড়ে। সেটা সহজ। কিন্তু মর্যাদা বাড়া মানেই যে উঁচু ধাপে উঠলো, তার কার্যক্ষমতাও বাড়ল তা নয়। সত্যি কথা ব'লতে গেলে—এরকম রাতারাতি প্রমোশন ঘটায় শাসনযন্ত্রটার ভিতরে অনেক

অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হ'য়ে গেল! স্বাধীনতার আগে যেটা একটা খণ্ড ছিল আজ তা হলো দ্বিখণ্ড। বিদেশী শাসকরা যখন ছিলেন, সরকারী যন্ত্রটা সেদিন ছিল একতান্ত্রিক। হোয়াইট হলের কথায় সেটা উঠতো আর বসতো! আদেশ আসতো ভাইস্‌রয়ের মাধ্যমে। সে আদেশ পেতেন গভর্ণর ও অন্যান্য কর্মচারীরা। দেশে বিভিন্ন রাজ্য সরকাররা ছিলেন বটে কিন্তু এগুলি, বিশেষ ক'রে এঁদের দেশ গঠনের বিভাগগুলি ছিল অলঙ্কার মাত্র। বিভাগে বিভাগে হিংসা, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি থাকার কথাই তাই ওঠেনি সেদিন। কিন্তু বিদেশী শক্তি যেদিন গেল—ক্ষমতার ভার এসে পড়লো কতকগুলি অসংবদ্ধ লোকের হাতে, এক-জনের হাতে নয় বা একটা মাত্র যন্ত্রের হাতেও নয়। এই অসংবদ্ধ লোকগুলি এতদিন ঐক্যবদ্ধ ছিল সে শুধু সাধারণ এক শত্রুর বিরুদ্ধাচরণের জন্য। কিন্তু এই শত্রুটা যখন স'রে গেল, একতার আর প্রয়োজন রইলো না—গোলমাল আরও ভয়াল হ'য়ে উঠলো তখনই। দেশের এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার অনম্য শক্তি যিনি ধারণ ক'রেছিলেন সেই মহাত্মাকে একটা পাগল করে ফেললো খুন। শক্তিমত্ত বিদেশী শাসকরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাসের সৌধ বুঝি ভাঙ্গে ভাঙ্গে। পাঁচশো পঞ্চান্নটি সামন্ততন্ত্র—সে তো গেল। কিন্তু সামন্ততন্ত্র—যার বাস আমাদের মজ্জায় আর সংস্কারে সে কি যায়? সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির সৃষ্টির মূলই তো ছিল, এই সংস্কার ও কৃষ্টিতে। একতন্ত্রটার প্রধান খণ্ডটা বিদেশী শাসকদের বিদায় নেবার ফলে যে বিরাট ভূমিকম্পরূপী দোলা তাতে লাগলো, তাতে কেঁপেছিল বটে, তবু একের পর এক বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে শুরু হলো রেষারেষি—কে কত চোখ ঝলসাতে পারে বহিরঙ্গের চমকানিতে তারই রেষারেষি। কে কত বস্তা কাগজ লিখে ফেলতে পারে, ছাপাতে পারে। আর হৈ চৈ ক'রে হ য ব র ল সৃষ্টি ক'রতে পারে—এই হলো তখন বড় কথা। কাজের কথা আর কে তোলে!

তাই বিদেশী শাসকরা চলে গেলেও তাদের ভূতটাকে তারা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতে ভোলেননি। ভূতটাকে চোখ রাঙ্গাতে পারে সে যন্ত্রটা তো আর রইলো না, তাই স্ফূর্তির সাগরে উঠতে লাগলো ঢেউর পরে ঢেউ। নাকানি চোবানি তখন আমাদের নতুন নেতাদের। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছে পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তু, আর পূব থেকে এসেছে ত্রিশ লক্ষ। অধিকাংশই

তাঁরা আস্তানা গাড়লো উন্মুক্ত তাঁবুতে। শীতে কাঁপলো, রোদে পুড়লো—কেউ কেউ আবার আমাদের নগর উপনগরীগুলির পথে পথে চটি ফট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ালো। এক হৃত সাম্রাজ্যের ভবঘুরে ভগ্নাবশেষ তারা। কিন্তু তাদেরই মধ্যে এক নতুন ভারত গঠনের মহা ঐশ্বর্য নিহিত হয়েছিল। হবে তারা নতুনতর আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। নয়া সড়ক ধরে এগিয়ে যাবার পরীক্ষা দিতে তারা পারে। শুধু পারে নয়—তারা যে প্রস্তুত। অভিশাপ নয়, এরা আশীর্বাদ। মৃত্যুর গহ্বর থেকে জীবনের পুনরুদ্ধার তাই সেদিন একেবারে অসম্ভব ছিল না। ভগবত দত্ত এক নতুন সুযোগ তখন যেন এসে প'ড়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ভাগ্য এক নতুন পরীক্ষার পথে। এই মনে হয়েছিল।




ট্রেনে পাকিস্থান সীমান্ত থেকে উদ্বাস্তুরা আসছেন



গোরুর গাড়ী করে উদ্বাস্তুরা আসছেন

## ॥ কুরুক্ষেত্র ॥

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মাঠ আর মাঠ—গ্রীষ্মের গরমে ফাটা, রোদে তাতা। শেষ হয়ে এলো গরমকাল।

এই হ'লো কুরুক্ষেত্রে, মহাকাব্যে বর্ণিত রণক্ষেত্র। যদিও শত শতাব্দী পূর্বে এই মাটির উপরে যা ঘটেছিল তার কোন লিখিত তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবু স্মৃতি ভেসে আসে। আজ আবার এক নতুন লড়াইর পটভূমিকা রচিত হয়েছে এখানে। তাঁবু পড়েছে চারিদিকে—এখানে সেখানে। সত্যি কথা ব'লতে গেলে কি সমস্ত কুরুক্ষেত্রটাই যেন এক তাঁবু-শহরে পরিণত হ'য়েছে। তিন লক্ষ লোকের নিবাস এখানে। আরও আসছে ক্ষণে ক্ষণে। যেমন আসছে তেমনি—যত আসছে প্রায় ততই—বহু লোককে রোজ এখান থেকে নির্গমন ক'রতে হ'চ্ছে, নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের জায়গা ক'রে দেবার জন্য। এটা ট্র্যানজিট ক্যাম্প মাত্র—সামনে দিয়েই ছুঁয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—কোন রকমে চলনসই মাত্র কতগুলো বাড়ি ও প্রবাহমান গরুর গাড়িতে ভরা। এ মহাযাত্রার যেন আর শেষ নেই। কুরুক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে রেল লাইনটি গেছে সেখানে প্রত্যহ ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে একটার পর একটা। এক একটা ট্রেন অনেকগুলি ক'রে বগী—স্ত্রী, পুরুষ আর কাচ্চাবাচ্চায় সব কটি ঠাসা। ছাদের উপরে, ট্রেনে থেকে ঝোঝুল্যমান—দুই বগীর মাঝখানের জায়গাটাতে খাটিয়া পেতে ব'সে গিয়েছে কতশত—মোদ্দা কথা সর্বত্রই মরি মরি পালাই পালাই ভাব। সমূলে উৎপাটিত এক মনুষ্য সমাজ ওলোট পালট হ'য়ে যাওয়া এক ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ দিয়ে পথ ক'রে চলে এসেছে। এরা বাঁচতে চায়। আশ্রয় চায় এতটুকু। সেই তাদের আশা। জীবন্ত দৃশ্য এই কুরুক্ষেত্র।

বহু বহু বৎসর আগে এই কুরুক্ষেত্রেই যুদ্ধ হ'য়েছিল। ভায়ে ভায়ে লড়াই হ'য়েছিল এক টুকরো জমির জন্য। কথা ছিল এখানেই নির্ধারিত হবে ভায়ের গলায় ছুরি বসাবার অধিকার কারো আছে কি; আরও নির্ধারিত হবার কথা ছিল লড়াই ক'রে কোন কিছুর চূড়ান্ত নির্ধারণ হয় কিনা তাই। এই ধরিত্রীতেই আবার লাগলো এসে নতুন জোয়ারের কঠিন আঘাত।

প্রথমটা কথা ছিল যে উদ্বাস্তুরা তাদের যাত্রাপথে এখানে একটা রাত কাটাবার মত আশ্রয় পাবেন শুধু। ক্রমে পরিণত হ'লো একটা স্থায়ী ক্যাম্পে। আজ এখানে প্রায় তিন লক্ষ লোকের আস্তানা। এখানে আগন্তুক যাঁরা তাঁদের বাড়ি ছিল সিন্ধে, পাঞ্জাবে আর, এন, ডব্লিউ, এফ, পিতে যে সব জায়গা জুড়ে সৃষ্টি হ'য়েছে আজ পাকিস্তানের পশ্চিম প্রদেশ। যাঁরা এসেছেন, ঘরে ফিরে যাবার পথ তাদের বন্ধ হয়েছে চিরতরে। ভারতবর্ষের নতুন সরকার এঁদের খাওয়ানো, পরানোর দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। মেডিক্যাল সাপ্লাইও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। দেশের বহু সমাজসেবী সংস্থাদের তরফ থেকে আগত জনসেবকরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন এঁদের সুখসুবিধা দেখবার জন্য। কিন্তু এত দেখাশুনা ও আদর এই লক্ষ লক্ষ মানুষের যত শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা তা মুছে ফেলতে পারলো কই? দীর্ঘায়ত তাঁদের দুঃখ, রোদে তপ্ত ক্ষুধার্ত ভাঙা জমির উপর হোঁচট খেয়ে পড়ল। বিদায় হল বিলীন হয়ে।

পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী মহোদয় সেদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন। এত অসুবিধা ও চারিদিকের অনটনের মধ্যেও এখানকার অধিবাসীদের মোটামুটি মাথা গোঁজবার মত একটা বন্দোবস্ত হয়েছে দেখে তিনি খুসী। এদের খাওয়া দাওয়া স্বাস্থ্য রক্ষা ও অন্যান্য জরুরি চাহিদাগুলি মিটাবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে তাও তিনি দেখলেন। কিন্তু এদের,—এই উদ্বাস্তু অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ কি এর কোন জবাবই তাঁর কাছে সেদিন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেনি। একটু দূরে তাঁবু শহরের সীমানার বাইরে এখানকার অধিবাসীদের নিয়ে একটি ছোট কর্মকেন্দ্র আমি খুলে বসেছি। আমার কর্মকেন্দ্র তাঁবু-দপ্তর তখন আমি সবে গোছগাছ ক'রছি। জন বারো লোক নিয়ে আমার কারবার। তার মধ্যে ছ'জন আর্মি ডিসপোসাল ক্যাম্প থেকে আনা কয়েকটি সেলাই মেশিন নিয়ে কাজ শুরু ক'রে দিয়েছেন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে দু'একজন যারা দর্জির কাজ জানতেন তাদের সাহায্যে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চ'লেছে। এমনি সময় সেক্রেটারী মহোদয়ের প্রবেশ সেখানে। টেলারিং সেকশানের কাজ হ'বে বস্ত্রহীন তাঁবুবাসীদের তৈরি জামা কাপড় জোগানো। এই সীবন কেন্দ্রের পাশেই আবার দেখা যাচ্ছে ছ'জন বিরাট বপু শিখকে। একটা গাছের গুঁড়ি খোলা রোদের মাঝে টেনে



উদ্বাস্তুদের তাঁবুর শহর



নিলোখেরির জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে

ফেলে কাটবার চেষ্টা ক'রছেন তাঁরা। তৈরি হয়েছে একটা কাঠ গড়ার মত জিনিস। গাছের গুঁড়ি কেটে তক্তা সৃষ্টি হবে। এই তাঁবু-শহরে বহু নতুন দপ্তর খোলা হচ্ছে প্রত্যহ। সেই সব অফিসে চাই আসবাবপত্র ও অনেক কাঠের কাজ। ক্রেতার যখন অভাব নেই তখন কাজ গোছাবার এমন সুযোগ ছাড়ে কে?

এই তাঁবু কর্মকেন্দ্রের ঠিক পাশেই বসে আছে তিন লক্ষ লোক। কর্মহীন। সমুদ্রব্যাপী স্থানুত্ব তাদের। তার ঠিক কাছাকাছি কর্ম ব্যস্ততার চাক বেঁধেছি আমি—দুটো পরিস্থিতির মধ্যে আসমান জমিন ফারাক তা এক লহমায় দেখলেই বোঝা যায়। আগন্তুক সেক্রেটারী মহোদয় আমাকে প্রশ্ন ক'রে বসলেন আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। কি করতে চাই আমি? যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসিত হ'চ্ছে, সেই পুনর্বাসন তথ্যের একটা চরম জবাব খোঁজার চেষ্টা ক'রছি আমি—এই জানালুম। তাঁকে প্রশ্ন করলুম এই যে ছ'জন বিরাট বপু শিখ কাজ করে চলেছেন তাঁদের মুখচ্ছবি আর অন্যান্য তিন লক্ষ তাঁবু অধিবাসীদের। আশঙ্কা ও বেদনাভরা মুখ এই দু'য়ের মধ্যে কোন তফাৎ তিনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা? সরকারী যন্ত্রটা তখন পুনর্বাসনের নামে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করে চলেছে ক্রমাগত। তাঁদের ধারণা, এই করেই এই বিরাট সমস্যার সমাধান মিলবে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের যে আজ সবার চেয়ে প্রয়োজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মের 'এই কথাটাই কর্মকর্তাদের একেবারে মনে হয়নি। কাজের মধ্যেই তো মানুষ অনিশ্চয়তার সমাধান পাবে। কাজ ক'রে রোজগার ক'রতে রাজী আছেন যাঁরা, তাঁদের রোজগারের সন্ধান দিতে হবে। তার পরে ঘর বাঁধা, বস্ত্র জোগানোর বন্দোবস্ত সবকিছু সহজ হবে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুল, ওষুধপত্র ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও হাত বাড়ালেই মুঠোর মধ্যে এসে প'ড়বে। আর কাজ না থাকলে চারিদিকেই তো অন্ধকার। দান ও দয়া অনেক কিছুই জোগাতে পারে কিন্তু তাদের ক্ষমতাও তো সীমিত। বিশেষ ক'রে গভর্ণমেণ্টের দয়া করবার ক্ষমতা তো কখনই সীমাহীন নয়।

তিন লক্ষ উদ্বাস্তু আছে এই ক্যাম্প টাউনে। আর তার চেয়েও সংখ্যায় অধিক অনেকে রয়েছেন বাইরে। ক্ষুধার্ত তাঁরা, বাঁচতে চান। বাঁচবার জন্য কাজ চান—যে কাজ জোগাবে তাঁদের জীবিকা যদি এর সঙ্গে যা তাদের

ন্যায্য রোজগার পাওনা সেটুকু তাঁদের হাতে পৌছে দেবার বন্দোবস্ত করা যায় তাহ'লেই বুঝি সব অভাব দূর হবে। যেটুকু বাকী থাকে সেটুকু তারা নিজেরাই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারেন। কিন্তু আমার বক্তব্য সেদিন তো শুধু পুঁথির কথামাত্র। সেদিনকার কর্ম স্রোতের বিরাট বিরুদ্ধাচরণ। সকলেরই তখন একটামাত্র ধারণা এই যে, এ উদ্বাস্তু জনস্রোতকে মাথা গোঁজবার মত কতকগুলি বাড়ি করে দিলেই তারা বাকিটা সব নিজেরা করে নিতে পারবেন! ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন যে কোনও রকমে খাবি খেয়ে বেঁচে আছে মাত্র এ কথাটা বোঝে কে? নগর, উপনগরীগুলিও সেদিন ছেয়ে গেছে ধুঁকধুঁকে প্রাণ অধিবাসীতে। কতলোক প'চছে বস্তিতে। আরো লোক যদি এসে পড়ে আর সীমিত ঐশ্বর্যের অপরিকল্পিত ব্যবহারে নগর উপনগরীগুলির বোঝা সব বাড়বে বইতো নয়। আরো একটা কথা বুঝে দেখা দরকার ছিল তখনই। ভারতবর্ষ থেকে যে সব মুসলমানরা উদ্বাস্তু হ'য়ে পাকিস্তানে চ'লে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন কুটির শিল্পী ও সুদক্ষ শিল্পকার। তাঁদের বদলী পাকিস্তান থেকে যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টর ও আইনজীবি।—এঁদের অর্থ উপার্জনের অন্যতম পন্থা হলো দালালী ব্যবসায় ও পরনির্ভরতা। জাতীয় তুষ্টির জন্য সম্পদ বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই। এঁদের কাজ করাতে হ'লে, জাতীয় সম্পদ এঁদের দ্বারা বাড়িয়ে তোলাতে হ'লে বোঝা উচিত ছিল যে এদের নতুন ভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে নতুন জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে। অগণ্য মানুষের এ মহা জোয়ারের মাঝে এই উদ্দেশ্য সাধন ক'রতে হ'লে চাই নতুন একটা আদর্শ আর সেই আদর্শে প্রাণভরা দীক্ষা। তারপরে আরও চাই, চাই দেশব্যাপী দানবী প্রচেষ্টা এই সত্যকে সার্থক করে তোলার জন্য।

নিজের হাতে ক্ষুদে কর্মকেন্দ্রটি গড়ে তোলার তাই চেষ্টা ক'রে চ'লেছি। এর কাজের প্রথম দিনেই আমার কাছে এই সত্যই প্রতিভাত যে এই নতুন তথ্যটির মধ্যে কোন ভুলত্রুটি নেই। যা বলেছি সেটুকু করে দেখানোর ওয়াস্তা মাত্র। পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী চোখ চেয়ে দেখলেন আমার ছ'জন শিখ জোয়ানকে। অস্তমিত সূর্যের স্বল্পাভাতেও তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়নি। অনেক শক্তির অধিকারী তিনি। এত তাঁর শক্তি যে সরকারী শাসনযন্ত্র তাঁকে বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের

সামনে যে বিরাট সমস্যা সেদিন প্রকট হ'য়েছিল তার সমাধান যেমনি পরিষ্কার ভাবে আমি দেখেছি এ ছ'জন শিখ জোয়ানের কাজে তার কিছুটা তিনিও যেন দেখতে পেয়েছেন মনে হ'লো। ব'লে উঠলেন, আগামী সপ্তাহের যে কোন দিন আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চান। তারপর বের হয়ে গেলেন। পার হয়ে গেলেন ক্রমবর্ধিত কলেবর আমাদের তাঁবু-শহরটির সীমানা।

## ॥ বিফল দেওয়ালে প্রথম আঘাত ঃ বৃথাই মাথা কোটা ॥

যে কর্মকেন্দ্রটির কথা এই মাত্র বললাম তার প্রথম আভাষ কি ক'রে মাথায় এল—অল্প কথায় তারই কিছু বর্ণনা দিতে চাই। পরে এই কেন্দ্রের যে বিকাশ ঘটলো, সে অভ্যুত্থানের কাহিনী ছোট্ট এবং সাধারণ একটি তথ্যের বিশদতর বিকাশমাত্র। সরকারী শাসনতন্ত্রটার উপর হঠাৎ যখন আমি হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম—সেদিন আমি ছিলাম সেখানে সম্পূর্ণ নবাগন্তুক। এ কথা ভূমিকাতেই বলা হ'য়েছে। যে নেশার বসে অপ্রতিহত গতিতে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিলাম তারও আভাষ দেওয়া হয়েছে। তবু একটি লৌহ কাঠামোর মধ্যে ঢুকে যাওয়া এক কথা, আর তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে না গিয়েও সেই কাঠামোটার সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে চলা সে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য এক কাহিনী।

তখন পুনর্বাসন দপ্তরের সবেমাত্র শুরু। বিভিন্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীরা এদিক সেদিক থেকে জড় হ'তে শুরু হ'য়েছেন আর তাঁদের সঙ্গে জড় হ'চ্ছে টেবিল চেয়ার, আসবাবপত্র, টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটর আরও কত কি আনুষঙ্গিক—যার প্রয়োজন পৃথিবীর সব সরকারেরই বুঝি চিরকাল হ'য়েছে। নামগোত্রহীন আমি, সেদিন এই নতুন জঙ্গলে হঠাৎ একটা বিজাতীয় পশুর উদয় হ'লে তার যেমন অবস্থা হয়, আমার অবস্থা প্রায় সেইরকম। সরকারের শাসনযান্ত্রিক সমাজে সঠিক পরিচয় পেশ করার মত প্রাক্তন সরকারী পালিশ সেদিন আমার কিছুই ছিল না। দিনের পর দিন তাই আমি ঘুরে মরেছি।—এক বারান্দা থেকে আরেক বারান্দায়। কখনও একজোড়া চেয়ার টেবিল হয়তো পেয়েছি কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার বেশি সেটাকে আমার ব'লে ধ'রে রাখতে পারিনি। আর অন্য কিছু সাহায্য পাব? সেকথা নাই বা তুললাম। এই অবস্থায় যে কিছু ক'রে ওঠা সম্ভব হবে না, সে কথাটা অন্ততঃ স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলাম। এরকম ভাবে বেশি দিন চলাও সম্ভব নয়, তাই কিছুটা হৈ চৈ লাগাতেই হ'লো। অবশেষে পাওয়া গেল। নর্থ ব্লকের চারতলায় জুটলো একটা ঘর। সে ঘরে বাতাস ঢোকে না। অব্যবহৃত আসবাব আর ফাইলপত্র রাখবার উপযুক্ত জায়গা সেটা। ঘরটার

নং হ'লো—যাক নাই বা ব'ললাম। হায়—এখনও কি সে ঘরটার সেই দশাই আছে? তবু এইটুকু শুভেচ্ছার প্রকাশ দেখেই আমি উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম। বল্লাম, একটা টাইপিস্ট চাই-ই এবং সেই চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবার জন্য নিজের খরচায়ই একজনকে নিযুক্ত ক'রে ফেললাম।

গোয়ালখানা হ'লেও অফিস পেয়েছি, পেয়েছি একজন সাহায্যকারী। টাইপ ও অন্যান্য কাজ সে করে। কিন্তু এসব এলেও 'কাকা' তখনও আসেনি। গজরাতে আর হাঁপাতে শুরু ক'রেছি তাই। পুনর্বাসন দপ্তর থেকে বেতন গ্রহণ ক'রতাম না। পরে বুঝলাম এইটাই আমার সর্বনাশের মূল। কারণ যাঁরা ভাগ্যবিধাতা, অন্ততঃ নিচের ধাপের ভাগ্যবিধাতা যাঁরা—তাঁরা এরকম একটা ব্যাপার কল্পনাও ক'রতে পারতেন না। এই নবাগন্তুকের কাছে কিছুতেই হার মানলে চ'লবে না অন্ততঃ এইটুকুর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাঁরা সেদিন বদ্ধপরিকর। আমি ইঞ্জিনীয়ার—কাজ করেছি কমার্শিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের। অনেক চেঁচামেচি করার পর আর্মি ডিসপোজালের বিরাট গহ্বর থেকে বেরুতে পারে কি কি পড়ে-থাকা-মাল, সেইগুলির একটা লিস্ট বা হিসেব করবার ভার প'ড়লো আমার উপর। এ সংক্রান্ত সব ফাইলও পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো আমার কাছে। জানানো হ'লো আমি যদি এই ফাইল সাগর মথিত ক'রে দেখে পুনর্বাসনের জন্য কোন কোন জিনিসগুলি কাজে লাগতে পারে তা নির্ধারণ ক'রে দিই, তবে তাদের বড়ই উপকার হয়। শিশুকাল থেকে আমার পেটে অবিরাম ক্ষুধা ছিল, তাই তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল নিবিড়। কাজেরও যে একটা ক্ষুধা হ'তে পারে আর তার তীব্রতা এই কাগজ রাজ্য সরকারী সেক্রেটারিয়েটে এসে পড়ার আগে আমি কখনও বুঝতে পারেনি। এই বিরাট কাগজ-সমুদ্র থেকে একবিন্দু কাগজও কি আমার টেবিলে পাঠিয়ে দিতে কর্মকর্তারা নারাজ। আগে থেকে আমি যে কাজে অভ্যস্ত ছিলাম তার ধরনই ছিলো সম্পূর্ণ উল্টোরকমের, তবু দুর্দান্ত ক্ষুধা নিয়ে আমি এই ফাইলরাশির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কি ক'রে যে পারলাম তা নিজে আজও বুঝতে পারি না। কিন্তু কি পরিমাণ কাগজরাশি যে পার হ'তে হবে এই অদ্ভুত কর্মভার থেকে মুক্তি পাবার জন্য তা সত্যি বুঝতে পারিনি। যতই কাগজ হটিয়ে দিই টেবিল থেকে, ততই কাগজ

উপচে উপচে পড়ে। তবু এই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। বুঝলাম, বিফল দেওয়ালের বিরুদ্ধে এই আমার প্রথম অভিযান। আরো বুঝলাম, হয় আমি নাশ ক'রবো এই শত্রুকে নয় ধ্বংস হবো নিজে, কিন্তু যাই হোক এক পক্ষকাল নিরন্তর সংগ্রামের ফলে কাগজের রাশি ক'মতে লাগলো। পারলাম ব'লে মনে হ'চ্ছে। আর্মিডিসপোজালে যা কিছু পাওয়া যেতে পারে তার একটা বিশদ বিবরণ আমি তিন সপ্তাহের মধ্যে ক'রে ফেললাম।

তারপর আবার সেই 'নেই'। কাজ নেই আমার। এদিকে শত সহস্র উদ্বাস্তুরা স্রোতের মত এসে প'ড়েছে। মন প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রতে চান, আর কর্ম অভিজ্ঞতা আছে এমন কর্মীর অভাব সর্বত্র সেদিন পরিলক্ষিত হ'য়েছে তবু আমার ভাগ্যে কাজ নেই। লড়াই না ক'রলে কাজ পাব না। তাই আবার শুরু ক'রে দিলাম আমার আন্দোলন। এবার ভার প'ড়লো পুনর্বাসনের জন্য একটি আদর্শ পরিকল্পনা ছোকে দেবার। চীন দেশের 'কৃপস'জের কথা আমি প'ড়েছিলাম। চীন জাপানের লড়াই-এর ফলে এরা ঘর ছাড়া হ'য়েছিল। হারিয়েছিল তাদের নিজস্ব বাসক্ষেত্র। কিভাবে চীনদেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে এদের পুনর্বাসন সম্ভব হ'য়েছিল সেকথা মনে ছিল। আরও মনে ছিল নিজের গ্রামের কথা, একটি পল্লীগ্রামের বুনিয়াদী চাহিদাগুলি যে কি, আর কি ক'রে মোটামুটি তা মেটাতে হয় সে সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এমনি একটা পরিকল্পনা করার ভার যখন আমার উপর প'ড়লো, মনে ক'রলাম স্বর্গ পেয়েছি হাতে। ঝাঁপিয়ে প'ড়লাম আমার স্বপ্ন সাগরে। নতুন কৃষি ও শিল্পমুখী এক সভ্যতা যার অগ্রভাগে থাকবে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাই বোনেরা তার পরিকল্পনায় মেতে গেলাম আমি। এক হপ্তার মধ্যে নক্সা তৈরি হ'য়ে গেল। এই পরিকল্পনার প্রথম সোপানে রাখলাম একটি স্বল্পপরিসর সমাজভূমিকে যার আয়তন প্রায় একটি গ্রামের সমান। এমনিভাবে শুরু এই পরিকল্পনার পরিণতি হলো ভারতবর্ষের সমগ্র গ্রামীন জনতাকে বেষ্টন ক'রে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা ভেবেছিলেন যে আমি এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসপের মত কিছু একটা তৈরি করার কথা ভাববো, কিন্তু আমি যে এমন একটা পরিকল্পনা গঠন ক'রবো যাতে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে সেকথা তারা ভাবতে পারেননি। স্বভাবতঃই গোটা মন্ত্রণা-

দপ্তরটার একজনও এই পরিকল্পনাটি খতিয়ে দেখবার বিন্দু মাত্র চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন না। কোনও একটা আলমারির অন্ধগলিতে গিয়ে আশ্রয় পেল আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিকল্পনা।

আবার সেই বেকার দশা। আবার কাজ নেই। দিনের পর দিন বসে আছি। আমার গোয়ালখানায় আলো বাতাসের গন্ধ ঢোকে না। এদিকে শীত এসে প'ড়েছে। অথচ ঘর গরম করার কোন বন্দোবস্তই নেই এখানে। কাজ তো নেইই, আর কখনও নিকট ভবিষ্যতে কোন সত্যিকারের কাজ এসে প'ড়বে চারিদিকের ভাবগতিক দেখে তাও মনে হয় না। তাই দাঁড়িয়ে থাকি আমি নর্থ ব্লকের ছাদে। কখনও কাঁদি, কখনও ফোঁপাই, ভাবি এমনি কেন হবে। কত কাজ করার আছে। প্রত্যহ নতুন নতুন কাজের কত বিশাল তাড়া। বেদনার্ত আমি, কিছু যে দিতে চাই সেই আমার বেদনা। নিতে কিছু চাই না তার বদলে। এ কি ক'রে হতে পারে যে দেবার অধিকারটুকুও আমার থাকবে না? শ্রীযুত কে, সি, নিয়োগী যিনি মন্ত্রী, তিনিই তো আমাকে এখানে প্রবেশ করিয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তাঁর দপ্তরে হাজির হতেই তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন "চলছে কেমন?" জবাবে বোমার মত ফেটে প'ড়লাম আমি। আত্মার যন্ত্রণা আমার প্রকাশ পেলো তীব্রতম প্রতিবাদে। বল্‌লাম—"কাউকে খুন ক'রবো ভাবছি।" "বুঝেছি। এখনও কাজ পাননি তো কিছু।"

"ঠিক করেছি কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে গিয়ে রাঁধুনির কাজ ক'রতে শুরু ক'রে দেবো। আমার বন্ধু বান্ধবদের মতে—যে রাঁধতে আমি ভালই পারি। তাঁরা চেখে দেখেছেন কিনা। তিন লক্ষ লোক যেখানে জড় হ'য়েছে সেখানে বারোয়ারী রান্নাঘর অনেকগুলি আছে নিশ্চয়ই। আর সে সব রান্নাঘরে বহু রাঁধুনিরও নিশ্চয়ই প্রয়োজনে আছে। সেই তাদেরই দলে যোগ দেবো। রাঁধবো নয়তো গাড়ি চালাবো, গাড়ি চালাতেও ভালোই পারি।" চিৎকার ক'রে উঠলাম আমি। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলাম কিনা। ভয়ঙ্কর কিছু ক'রে ফেলতে আমি তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবু যা কিছু সেদিন বলেছিলাম, সে সবই আমি একান্ত সত্য জেনেই উচ্চারণ ক'রেছিলাম। ক্ষুধার্ত আমি—কর্ম ক্ষুধায় যে বুভুক্ষু, খাবারের জন্য ক্ষুধার্ত যে, তার চেয়েও সে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বললেন—আমি যেন কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে

তার পরদিনই চ'লে যাই, আর দেখে শুনে এসে তাঁকে জানাই কি কাজে হাত লাগাতে আমার মন চায়। ঐ বিশাল ক্যাম্পের মাত্র কয়েকজনের পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমি যদি চাই নিতে পারি। একাজ ক'রতে হ'লে যা কিছু অর্থ সম্পদের প্রয়োজনে তা পাওয়া যাবে এ আশা তিনি দিলেন। ডিফেন্স মন্ত্রণালয়ে আমার এক বন্ধু ছিলেন তিনি দিলেন একটা মিলিটারী গাড়ি। ধাবিত হ'লাম দিল্লী ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। গতিপথে একটার পর একটা মাইল পোস্ট পার হয় আর স্বাধীনতার ফলে জোর ক'রে দেশ দুভাগ করার জন্যে সৃষ্ট এই উদ্বাস্তু সমস্যাটার সত্যিকারের চেহারাটা যেন আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে—ধীরে ধীরে, কিন্তু স্পষ্টতর রূপে।

GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
Extension Services Dept.

## ॥ নতুন পেশা শিক্ষণ কেন্দ্র ॥

কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প তৈরির গোড়ার কথা আর সেখানে উদ্বাস্তুরা যে কি রকম ভাবে বাস ক'রছিলেন সে কথা আগেই ব'লেছি। নর্থ ব্লক সেক্রেটারিয়েটে কিছুদিন থেকেই এটুকু আমার কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'য়েছিল যে মানুষ খাবার চায় বটে কিন্তু তার উদগ্রতর কামনা খুঁজে মরে কাজ। কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে যদি কর্ম সংস্থান করাতে হয় তা হ'লে এমনভাবে বন্দোবস্ত ক'রতে হবে যাতে ঐ তাঁবু-শহরেরই বহু দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর মত জিনিসপত্র তৈরি ও কর্ম সরবরাহের ভার ঐ কর্মকেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা যায়। যা প্রস্তুত হবে আর ক্যাম্পের চাহিদা এই দুয়ের মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য ক'রতেই হবে তা না হ'লে বেশিদিন কাজ পাওয়া যাবে না। এই সব তাঁবুতে যাঁরা এসে হাজির হয়েছেন, আমি বুঝাতে পেরেছিলাম তাদের মধ্যে অনেকেরই হাতে কলমে কোন কাজ করার অভ্যাস ছিল না। দোকানীর কাজে লাগিয়ে দিলে অর্থাৎ যে কাজে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই তা তারা ভালই পারবেন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে এই ধরনের দোকানী দালালীর কাজ দেওয়া যেতে পারতো বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই হাতের কাজে টেনে নামাতে হবে যাতে ক'রে তাঁরা দ্রব্য প্রস্তুত-কারক হ'তে পারেন, তা না হ'লে এত কাজ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? এইখানে এই নতুন নাগরিকদের জীবন গঠনের কাজে তাই নতুন পেশা রপ্ত করার জন্য হাতের কাজ শেখানোটাই প্রধান কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়ালো।

ক্যাম্পে পা দিয়েই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানে বস্ত্র সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। তিন লক্ষ লোক জড় হ'য়েছেন ছোট্ট একটা খোলা জায়গায়— আরও শত সহস্র লোক প্রত্যহ এসে হাজির হ'চ্ছেন। এখানকার রান্না ঘরের ধোঁয়া আর পায়ে চলা পথের ধুলায় যে স্বল্প বস্ত্র সম্বল ক'রে তাঁরা এসেছেন তাও বার বার নোংরা হ'য়ে যাচ্ছে। সেগুলি ধুতেও হবে। তাই কাপড় তো চাই-ই, আরও চাই সাবান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরের অবস্থা তখন। তাই দৈনন্দিন চাহিদার যা কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন তা কিছুই তখন পাওয়া যায় না। ঠিক বুঝলাম যে এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে এমন

কিছু লোক আছেনই যাঁরা মোটামুটি দর্জি ও তাঁতের কাজ জানেন। একটা ট্রেনিং এর সংগে প্রোডাকশান কেন্দ্রের নক্সা ছ'কে ফেললাম। সেখানে চ'লবে তাঁতের কাজ। বন্দোবস্ত থাকবে ক্যালিকো প্রিন্টিং-এর, দর্জির কাজের আর সাবান তৈরির। যা কিছু তৈরি হবে এই কর্মকেন্দ্রে, তাঁবু-শহরের বিরাট চাহিদা তা হু হু ক'রে শুষে নেবে। আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে এসব কাজে যাঁদের কিছুটা বা পটুত্ব ছিল তাঁরা এই সূত্রে পাবেন একটা জীবিকার সন্ধান। আমার এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী—যাঁরা কাজ জানেন এই কর্মকেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁদের কাজ দেবো, আর নতুন কাজ যাঁরা শিখতে ইচ্ছুক তাঁদের হাতের পেশীকে শিক্ষিত ক'রে তুলবো যাতে ক'রে তাঁরা নতুন কাজ পেতে পারেন আর নিজেদের জীবিকার সন্ধান ক'রে নিতে পারেন নিজেরাই। চারজন দক্ষ উপদেষ্টা পেয়ে গেলাম এই কাজ চালাবার জন্য। তাদের মধ্যে দুজনকে এই ক্যাম্প থেকেই পাওয়া গেল, বাকী দু'জনকে আনা হ'লো দিল্লী থেকে। পুনর্বাসন দপ্তর এই পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রের চতুর্মুখী পরিকল্পনাটি অনুমোদন ক'রে দিলেন। সতেরো হাজার টাকার এই স্কীমটি ১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মঞ্জুরী লাভ ক'রলো। তখন হঠাৎ হাতে চালানো তাঁতের কথা ভেবেছি কাপড় তৈরি করার জন্যে। কিন্তু তাঁত যে কি বস্তু তা তখনও চোখে দেখিনি। একটা তাঁত কিনবো এই মনে ক'রে দিল্লীর চাঁদনী চকে এসে হাজির হ'লাম। শুনলাম, একটা তাঁত তৈরি ক'রে দিতে সেখানে একমাস সময় লাগবে। তাঁতের সন্ধানে সেখান থেকে বেরিয়ে সমস্ত দিল্লী শহরটা চ'ষে ফেল্লাম, কিন্তু সুবিধা হ'লো না বিশেষ কিছুই। আমার তখন প্রয়োজন সময়রূপী সমস্যাটাকে জয় করা। হয় কাল জয় করব, নয় তো এই কালই আমার কাল হবে। এমনি সময় হঠাৎ মনে পড়লো আমি না এঞ্জিনীয়ার। তৈরি তাঁত পাওয়াই যদি না যায় এই তাঁবু-নগরীতেই তাঁত তৈরির বন্দোবস্ত করা যায় না নাকি ? কাঠের কাজের একটা বিভাগ খুলে দেবো, আমার বিশাল বপু শিখ বন্ধুরা তাদের গর্বের শ্রম দিয়ে মুখরিত ক'রে তুলবেন এই বিভাগকে। মন্ত্রণালয় আরও দু' হাজার টাকা মঞ্জুর ক'রলেন কাঠের কাজ শুরু করার জন্যে। ছুতোরের যন্ত্রপাতি কিনবার জন্যে আবার হাজির হলাম দিল্লীর বাজারে, দেখলাম তাও নেই। তখন স্থির করলাম যে একটা কামারশালা খুলে দিই না কেন, আমাদের যা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা নিজেরাই তৈরি করে

নেবো। ক'রতেই হবে। মন্ত্রণালয় আরও দু' হাজার টাকা ধ'রে দিলেন কামারশালা খোলবার জন্যে। তখন দেখলাম এ কাজ চালাতে হ'লে দরকার একটা হাপরের। হায়! হাপরও পাওয়া যায় না। তাই আবার মাথায় খেললো একটা ফাউণ্ড্রি বিভাগ খুলে দিই না কেন। আর তখন এত কাজ ফেঁদে ব'সেছি যে, আমার যা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সে সব তাঁবুতে এনে ফেলবার জন্য কুরুক্ষেত্র শাসনতন্ত্রের হাতে যে কয়েকটি মাত্র যানবাহন ছিল তাতে করে আমার কাজ চ'লতো না। তাই ভাবলাম এবার একটা যানবাহন বিভাগ ফেঁদে ব'সবো। যখন মিলিটারির উদ্বৃত্ত জিনিসপত্রের লিস্ট করার ভার পেয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে অনেকগুলি গাড়ি অলস হ'য়ে প'ড়ে আছে গ্যারেজে। কিন্তু এই গাড়িগুলি কাজে লাগাতে হ'লে অনেক মেরামতির প্রয়োজন। প্রথম মেরামতির পর গাড়িগুলি হাতে এসে প'ড়লেও তাদের যে অবস্থা তার জন্য চালু রাখবার মত দৈনন্দিন মেরামতিও চাই, আরও চাই গাড়ি চালাবার জন্য ড্রাইভার। গাড়ি চালানোর কাজ শেখাবার জন্য একটা ড্রাইভার ট্রেণিং ও মোটর মেকানিক শিক্ষণ বিভাগ খুলে দিলাম। জানতাম যাঁরা এখানে শিক্ষিত হবেন তাদের কাজের অভাব হবে না। গোটা ক্যাম্প-টাতেই যত যানবাহন আছে তাদের চালনা ও মেরামতির জন্য বহু অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন।

শুনেছি একটুকরো সাদা কাপড়কে ভিত্তি ক'রে একটা গ্রামের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'লো। সরকারী দপ্তরগুলি কাগজে কলমে পরিকল্পনার কাঠামো গড়ে তুলতে খুবই ওস্তাদ, এ বিষয়ে আমার চেয়ে তাদের কেরামতি অনেক বেশি। তাই তাদের উপর টেক্কা দিতে হলে – আমি যে পরিকল্পনার কথা ভেবেছি তা শুধু তত্ত্ব কথা হ'য়ে থাকলে চ'লবে না। শক্ত মাটির উপর পরিকল্পনাটির ভিত্তি অতি সত্বর পত্তন হওয়া চাই। যে কর্তব্য ভারকে হৃদয়ের একান্ত কাছাকাছি লালন ক'রেছি এতদিন তার মহত্ব শুধু লিখিত ভাবে প্রচার ক'রলে চ'লবে না! ক'রে, গ'ড়ে দেখাতে হবে তার তাৎপর্য। দিল্লী ক্যান্টনমেণ্টের গুদাম থেকে সংগ্রহ ক'রলাম কয়েকটা ঊষা সেলাইর কল। ক্যাম্পে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের দর্জির কাজ জানা ছিল, তাঁরা হাত লাগালেন। আরও ছিলেন কয়েকজন, যাঁরা ছুতোরের কাজ জানতেন। এঁরা শিখ। করাত আর

মোটামুটি কতকগুলি চলনসই যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেলেন সবাই। এর আগে যে কেন্দ্র গঠনের কথা বলেছি সে কাজের এই হ'লো গোড়াপত্তন। পরিকল্পনা দপ্তরের অদম্য সম্পাদক মহাশয়ের কথানুসারে তার পরের সোমবার যথা নির্দিষ্ট সময় তার অফিসে হাজিরা দিলাম। "কত টাকা চাই আপনার?" —ঘরে পা দিতেই এই হ'লো প্রথমতম প্রশ্ন। নাচেরে হৃদয়, অশান্ত উত্তেজনায় নাচল আমার হৃদয়। বললাম "পাঁচ লাখ।" এর পরের প্রশ্ন যা হ'লো আমি তা আগেই জানতাম। "এত কেন চান?" একটা গোটা পরিকল্পনা শুভ্র কাগজে ছ'কে নিয়ে গিয়েছিলাম। গুঁজে দিলাম তাঁর হাতে। পরিকল্পনা সম্বলিত লেপাফাটির দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ ক'রলেন, কিন্তু তার বন্ধ মুখ খুলে দেখাবার কোন প্রচেষ্টাই তিনি ক'রলেন না। ব'ললেন—"এই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি রহস্য আপনার মুখেই প্রতিভাত, এক সপ্তাহ পরে আসবেন; দেবো।" এর পরের সোমবারে আমার পরিকল্পনাটি মঞ্জুর করার জন্য একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল। অর্থদপ্তরের উচ্চপদাধিকারী কর্মচারী বসেছেন এক-দিকে, অন্যদিকে পুনর্বাসন দপ্তরের একজন উচ্চধাপ আসীন কর্মচারী, মাঝে বসেছেন একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। আমার প্রার্থিত পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও আমাকে কাজ ক'রতে দেবার জন্য যথাযোগ্য স্বাধীনভাবে চলার শক্তি দিতে হবে। এ সম্বন্ধে এঁদের সকলকেই ওয়াকিবহাল ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল ব'লে মনে হ'লো। অর্থদপ্তরের কর্মচারীটিকে পরিকল্পনা দপ্তর থেকে যিনি এনেছেন তিনি আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ একটুকরো কাগজে কি লিখে গুঁজে দিলেন। কিছুক্ষণ এটা সেটা তর্কাতর্কির পরে স্কীম মঞ্জুর হ'য়ে গেল। অর্থ দপ্তর থেকে যিনি এসেছিলেন তিনিই বেশি উৎসাহ দেখালেন, পরিকল্পনা দপ্তরের সঙ্গীটি যে এ ব্যাপারে খুব একটা খুসী তা মনে হ'লো না। অতি সুযোগ্য কর্মচারী এঁরা দুজনেই। এঁদের মধ্যে একজন আজ আর ইহজগতে নেই। সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোটা এহাত ওহাত বদল হ'লো। তার বক্তব্য কি ছিল সেদিন তা জানতে পারেনি। বহু বছর পরে জেনেছিলাম যে পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মচারী তাঁর অর্থদপ্তরের বন্ধুকে অনুরোধ ক'রেছিলেন যে, এই বর্বর লোকটার হাত থেকে পরিকল্পনাটিকে সরিয়ে নিতে হবে। নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে এই বর্বর সে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় তাহ'লে সমস্ত শাসনযন্ত্রটাকেই উল্টে দেবে বোধ হয়। অর্থ-

দপ্তরের জবাবটা ছিলো আরও মজার। সেই কাগজেরই উল্টো পিঠে লিখে দিয়েছিলেন যে অঘটন যদি কিছু ঘটে তা ঘট্‌তে ঘট্‌তে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় এসে যাবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটুকু তাঁর সফল হোক সেটুকুই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। স্কীম এলো বা গেল তাঁর জন্য তার মাথাব্যথা নেই।

সরকারী ব্যবস্থায় যা কখনও ঘটে না তাই ঘটে গেল। ৩রা জানুয়ারী যে পরিকল্পনা পেশ ক'রেছিলাম ১০ই জানুয়ারী তার মঞ্জুরী হয়ে গেল। তার পরে উর্ধ্বশ্বাসে এসেছি বাঙ্‌লা দেশে, মিলিটারী ডিসপোজাল স্টোর ও মার্কিনী চেস ক্যাম্প ও অন্যান্য সম্ভাব্য সব জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে ঘুরে দেখেছি। চোখের পলকে যত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যায়, যেখানে যা পেয়েছি জড় ক'রে ফেলে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এলাম আসল তাঁবু-শহরের সংলগ্ন ক্ষুদ্রতর একটি তাঁবু উপনিবেশে। আমার পেশা শিক্ষণ ও প্রস্তুত কেন্দ্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নতুন কর্মের মধুচক্রে যোগ দিয়েছেন সেদিন সাড়ে সাতশো শিক্ষানবিশ, আড়াইশো দক্ষকর্মী, আর পঞ্চাশ জন শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলী। সূতা কাটা, তাঁতবোনা, দর্জির কাজ, ধোপার কাজ, সাবান তৈরি, ক্যালিকো প্রিন্টিং, চামড়া ট্যানিং, কামারশালা, ছুতোর ঘর, টিনের কাজ, থালা তৈরির কাজ, ফাউণ্ড্রী, মটর চালানো ও তার মেরামতি, হাঁস আর মুরগীশালা, কুমোরের ঘর, সব বসে গেল পাশাপাশি, এমন কি একটা নাপিতের দোকান শুদ্ধ্ খাড়া হ'য়ে গেল। মিলিটারী ডিসপোজাল থেকে যে সব যন্ত্রপাতি এনেছিলাম সেগুলো খুলে ফেললাম টানাটানি ক'রে। ঘ'ষে, মেজে নতুন ক'রে ফেলা হ'লো তাদের। সামনেই তাঁবু-শহর। সেখানে সকলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে—ঠিক তার পাশে কর্মচাঞ্চল্যে ভরা এই পেশা কেন্দ্র যেন একটা মরূদ্যান। পিলপিল ক'রে লোক ঢুকছে এই প্রাণকেন্দ্রে। সকাল থেকে সন্ধ্যে নবকর্ম সন্ধানীদের অবিরত গতি এখানে।

১৯৪৮ সালে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। চতুর্দিকের দুনিয়াভরা অলসতা আর একটা হায় হায় ভাব যেন নাসিকারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ ক'রে তাঁকে বিরক্তিতে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন খুব। এই পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রেও তাঁর পরিদর্শন ক'রবার কথা। এখানকার প্রবেশ দ্বারে যখন তাঁকে অভিনন্দন ক'রে নিয়ে যাব ব'লে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি তিনি প্রায় ক্রোধমত্ত। এই প্রথম—

আমার এই প্রথম মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে। "দেখবার আছে কি এখানে"—চিৎকার করে উঠেছেন প্রায়। আতঙ্কিত ও বিস্মিত হ'য়ে আমি বলে উঠলাম "ঢোকার আগেই আপনি এত রেগে গিয়েছেন কেন?" এই কথায় হঠাৎ হেসে ফেল্লেন, পলকে মানুষটা যেন বদলে গেল। ঢুকে প'ড়লেন আমার তাঁবু-কর্মকেন্দ্রে, একটির পর একটি কর্মসংগঠন পরিদর্শন ক'রে চ'ললেন। আর কেমন স্তব্ধ চিন্তামণ্ডিত মননশীল হ'য়ে যাচ্ছেন যেন। আমাদের বহু কর্মীর সামনে দিয়ে উনি পার হ'য়ে গেলেন। কাজ ক'রে চ'লেছে ওরা, স্ত্রী পুরুষের দল—কেউ কিন্তু একবারের জন্যও কাজ ফেলে মাথা তুলে তাকায়নি। সৈনিক দলের মত, অথচ স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা চারিদিকেই দেখতে পেলেন। কাজের উপরে কি ঘন মনোনিবেশ সকলের! অথচ আনন্দ ও অসীম ভরসার স্পষ্ট প্রকাশ এদের সকলেরই চোখে মুখে। একটা নেশায় পেয়ে ব'সলো যেন পণ্ডিতজীকে। পরিদর্শন সমাপ্ত ক'রে আমার তাঁবু-কেন্দ্রের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন। এই ঘরের মাদুর বাঁধানো দেওয়ালে অসংখ্য গ্রাফ ঝুলছিলো। এই কেন্দ্র কেমন ভাবে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে তার প্রতি সপ্তাহের ইতিহাস ছ'কে দেওয়া ছিল। যারা এখানে কাজ করেন তাঁদের শ্রম মূল্যের হার, দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য—সব কিছু খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। কথা একটিও বললেন না কিন্তু। অফিস ঘরের সামনে আমার প্রায় চল্লিশ জন সহকর্মী বিরাট তাগড়া জোয়ান তারা পংক্তি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, পণ্ডিতজী বেরিয়ে এলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবে সেজন্যে। প্রধানমন্ত্রী তাদের সামনে দিয়ে এলেন। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলেন "ইয়ে হো সেকতা তো ইয়ে কিঁউ নেহি হোতা হ্যায়।" কথাটা বলেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেলেন। আমরা হতচকিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আশা করেছিলেন অন্ততঃ একটা পিঠ চাপড়ানি বা উৎসাহ উদ্দীপক বাণী তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। আমি বুঝেছিলাম যে তাঁর যা বলবার তার অনেক বেশি বলা হ'য়ে গেছে।

এর কিছু পরে হঠাৎ খবর পেলাম প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার ডাক প'ড়েছে। গিয়ে দাঁড়াতেই দুর্বার গতিতে যেন ঝাঁপ দিয়ে প'ড়লেন আমার উপরে।—

"মতলবটা কি আপনার? কি চান?"

"কি চাই?" কিছু না ভেবে চিন্তে আমিও জবাব দিয়ে উঠলাম "মানুষরূপী জঙ্গল কেটে বানাতে একটি বাগিচা। ১৫ই অগাস্টের পরেরকার নতুন ভারতবাসীর সন্ধান ক'রতে চাই। তাঁরা বাস ক'রবে, বানাবে, আর বাড়াবে এই বাগানকে।"

"এতই সাচ্চা আপনি হলপ ক'রে বলতে পারেন?"

"পারি"—আবার সেই জবাব আমার "যেমনিভাবে বলতে পারি যে কাল সকালেই আবার সূর্য উঠবে।" মনে আছে সেদিন আর কোন কথা হয়নি। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী চ'লে গেলেন। যাবার আগে দিল্লীতে ফেরার পথে একটি সাধারণ জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়ে গেলেন। শুনলাম সেখানে ব'লেছেন যে 'ভারতবর্ষের চারিদিকে এমন সহস্র উপনগরীর সৃষ্টি হোক যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ বাঁচবে, জীবন মুখর হবে, যেমনটি তিনি দেখেছেন কুরুক্ষেত্রের পেশা শিক্ষণ ও দ্রব্য প্রস্তুত কেন্দ্রে। এই তাঁর কামনা।' বুঝলাম একটি বীজ আজ বপন হ'য়ে গেছে। আর একদিন এই বীজ থেকে বিরাট এক মহীরুহ বিকশিত হবে।

Acc. no.- 15138.

## ॥ "মজদুর মঞ্জিল" ॥

—নয়া সড়ক—

প্রধানমন্ত্রী ব'লেছেন 'হাতের পেশীর গান মুখরিত হ'য়ে উঠুক'। ভারতবর্ষের দিকে দিকে ধ্বনিত হোক এই গান। তাঁর কানে এসে বাজুক। এই তাঁর কামনা। কথাটার ঠিক মানে কি—এই প্রশ্নটা সেদিন মনে মনে ভেবেছি। পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রে নিজে এসে দেখে গেলেন যে আবাল বৃদ্ধ সকলে নিজের হাত খাটিয়ে কি করে কাজ করা যায় সেই শিক্ষা আহরণ ক'রছেন। জীবন ধারণের জন্য যা কিছু চাহিদা এই পেশা কেন্দ্রে তা প্রায় সব কিছুই প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত তিনি দেখেছিলেন। আহার্য, কাপড়চোপড়, আশ্রয় ও যানবাহনের ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে বিলাস-ব্যসনের বস্তু অবধি সব কিছুই তো মানুষ নিজের হাতে তৈরি করে। দ্রব্যসৃষ্টির কাজকে যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে। তাই হাতের পেশীর শুধু সঞ্চালন হ'লেই চ'লবে না, ছন্দোবদ্ধ সংগীতের তালে তালে তাকে খাপ খাওয়াতে হবে। হস্তপেশীকে তাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কি করে কাজ ক'রতে হয় সেই শিক্ষা দিতে হবে। তবু শুধু সুশিক্ষিত হ'লে চ'লবে না। হাতের কাজের ফলে সুসংবদ্ধভাবে প্রস্তুত যে কাজ তাকে নিজে পরিচালিত ক'রতে হ'লে চাই বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। এক সুরে বাঁধার জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ নেতার, আর একটি যথার্থ পরিস্থিতির। এমনি যথার্থ পরিস্থিতি চাই, যাতে ক'রে চারপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে বাদ্যযন্ত্র আপনিই সম্মিলিত রূপ ধারণ করে। এই ভাবে ভাবিত হ'য়েছি সেদিন আমরা। আর এর থেকে সূচনা হ'য়েছে ত্রয়ী মন্ত্রের। আমাদের বিশ্বাসের উপর তার ভিত্তি। সে মন্ত্র হ'ল :—

"পেশী পারবে"।

"পেশীকে শিক্ষিত উপযুক্ত ক'রে তোলা যাবে যাতে ক'রে সে পারে"।

"এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাবে, যাতে এ সবই সম্ভব হবে।"

এই ত্রয়ী বিশ্বাস মন্ত্র থেকে সৃষ্টি হ'লো ত্রিমুখী সনদের—তিন বিশ্বাস মন্ত্রের উপর তার ভিত্তি, মনুষ্যজাতির মৌলিক অধিকারের প্রতীক সে সনদের। সে তিনটিই হোল গোড়ার কথা।

"বাঁচবার অধিকার।"

"জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করবার"।

"যে যা রোজগার করেছে তার আহৃত বস্তুর উপর পূর্ণ দাবির অধিকার।"

পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ যে আবাল বৃদ্ধ বণিতা উদ্বাস্তু হ'য়ে এসেছে, ভারতবর্ষের নতুন নাগরিক হিসাবে এই অধিকারগুলির দিকে তাঁরা তাকিয়ে আছেন। হিন্দু আর মুসলমান একই বৃন্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবুও আজ যদি তারা দুই জাতিতে বিভক্ত হ'য়ে থাকে, যে প্রবৃত্তি তাদের বিভক্ত ক'রেছে আজ তার অনন্যশক্তি জাত, ধর্ম, রাজনৈতিক মত, ভাষা, উপভাষা, আচার, বিচার এই সকলের ভিত্তিতেই দেশকে আরও টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে দিতে পারে। জ্বালাতে পারে দাবানল। ১৯৪৭ এর ১৫ই অগাস্টের পর যে সব অঘটন ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ ক'রতে হ'লে এই কটা মূলগত দাবিতে সকল লোকের অধিকার তাই মেনে নিতে হবে।

"মজদুর মঞ্জিল নয়া ভারতে পৌছাবার সড়ক", এই নাম দিয়ে একটি নতুন পরিকল্পনা রচিত হ'লো। উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনই এই পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য। এই উপমহাদেশের সকল বাসিন্দারই পুনর্বাসনের মাল মশলা আর দেশ গঠনের যে সমস্ত সমস্যার কথা একটু আগে বিবৃত করেছি তা সবের সমাধানের সন্ধান এই পরিকল্পনায় পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প থেকে ঠিক ফিরে যাবার পরেই পুনর্বাসন দপ্তরে পরিকল্পনাটি পেশ ক'রে দিলাম। পরিকল্পনাটির মূল বক্তব্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক গ্রামেই বাস করবে এই ধারণার উপরে ভিত্তি ক'রে রচিত হ'য়েছিল। আর গ্রামে যদি এঁদের থাকতে হয় তা'হলে আমাদের দেশব্যাপী পরিকল্পনা তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রয়োজন। আজ গ্রাম থেকে শহরের পথ খোলা। রোজগারের তাগিদে একমুখো এই আন্দোলন বন্ধ ক'রতে হবে, আর তার সঙ্গে বন্ধ ক'রতে হবে শ্রমিক, মালমশলা, দক্ষ শিল্পী ও সংস্কৃতির একমুখো উর্ধ্বগতি শহরের দিকে। এ ক'রতে হ'লে চাই, বেঁচে থাকবার জন্য যে সমস্ত বিশেষ সুখ সুবিধাগুলির প্রয়োজন আর সে সবেরই একচেটিয়া অধিকার আজমাত্র শহরবাসীর সেগুলোকে গ্রামে পৌছে দেওয়া। এ ক'রতে হ'লে শুধু

শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ক'রলেই চ'লবে না, তার সঙ্গে চাই অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। ভারতবর্ষের আগামী দিনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে চাই কৃষি ও শিল্প এই দ্বিবিধ বুনুনী।

যেমন একগাদা লোক নেতাবিহীন হ'য়ে প'ড়লে তারা উচ্ছৃঙ্খল জনতা হ'য়ে পড়ে, গ্রাম রাজ্যেরও তেমনি অবস্থা। অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে গ্রামাঞ্চলের নেতৃত্ব ভার গিয়ে প'ড়তেই হবে কোন কেন্দ্রীভূত উপনগরীর উপর। এই উপনগরই হবে মধ্যমণি যাকে ঘিরে চারিদিককার গ্রামের উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে উঠবে। আজ ব্যাপারটা ঘটছে অন্যরকম। একটা ফোড়া যেমন শরীরের উপর আগাছার মত বেড়ে ওঠে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের উপর ভর ক'র দাঁড়িয়ে আছে পরনির্ভরশীল শহুরে সভ্যতা। শহরের কথাই ধরা যাক না কেন? এই সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে যারা পেশী খাটিয়ে খায় তাদের উপরে যারা কলম চালায় তাদের কর্তৃত্ব জাহির করে। মসিজীবিদের মধ্যে আবার তারাই প্রধান যারা বক্তৃতায় সরগড়; তারাই চরিয়ে খাচ্ছেন যারা কলম চালিয়ে পিষ্ট হ'চ্ছে তাদেরকে। আজকে দেশের বড় কথাই হ'লো যেন সহশোষণ। সহাবস্থানের পাত্তা অবধি নেই। বেশিদিন একটা ফোড়া থাকলে শরীরটাই যেমন ধ্বংস হ'য়ে যায়, তেমনি সভ্যতাকে বাঁচতে হ'লে শোষণের জায়গায় বসাতে হবে সহঅবস্থানকে। বাঁচবার নয়া সড়ক ধ'রে এগোতে হবে আগামী কালকে। গভীর গহ্বরের মধ্যে হোঁচট খেয়ে প'ড়লে চলবে না। মানুষে মানুষে গ্রামে শহরে চাই সুসম আদানপ্রদান। নতুন সমাজে কিছু না দিয়েই অনেক কিছু সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিকে নষ্ট ক'রে দিতে হবে। আর অনেকদিন ধ'রে যারা অনেক পেয়েছেন কিছুমাত্র না দিয়েই, আজ বোধ হয় অনেক দিতে হবে তাদের—কিছুমাত্র পাবার প্রত্যাশা না ক'রেই। পরিকল্পনা দপ্তরে যে "মজদুর মঞ্জিল" নামক প্ল্যানটি পেশ করেছিলাম, এই জীবনদর্শনের মূলমন্ত্রের ভিত্তিতেই তা গঠিত হ'য়েছিল। শুধু দর্শন নয়, পদার্থ শক্তিও সংগ্রহিত করা হ'য়েছিল তাতে কিন্তু সেটা ঘটেছিল কিছু পরে।

পাঁচ হাজার লোকের বাস এমনি একটি উপনগরীকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠবে মজদুর মঞ্জিল। লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি হবে না, কারণ

উপনগরীর চেহারাটা হবে আধা শহর আধা গ্রাম ঘেঁষা। পরিকল্পনাভূমিটি হবে নাতিদীর্ঘ যাতে সকলের সঙ্গে সকলের নিবিষ্ট আদান প্রদান হ'তে পারে। একটা বৃহৎ গ্রাম পরিবারের মত গ'ড়ে উঠবে এই মজতুর মঞ্জিল। চারিপাশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকবে সুসংবদ্ধ যানবাহনের আয়োজন। একজনের ঘাড়ে ভর দিয়ে অন্যজন ব'সে খাবে এ ব্যাপারটা নয়া ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই অসম্ভব হ'য়ে প'ড়বে। এই গ্রামাঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত কৃষি ও কৃষিজাতীয় পণ্য পাঠানো হবে শহরে, শহর থেকে আসবে নতুন দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা এই কেন্দ্রীভূত উপনগরীর মাধ্যমে। উপনগরীতে যা কিছু দ্রব্য সম্ভারের সৃষ্টি হবে, শহরবাসী সুদক্ষ শিল্পী আর চারপাশের গ্রামদেশ থেকে আহরিত গ্রাম্য শিল্পীর যোগাযোগে গ্রামের বাড়তি হাত যারা, তারা এমনিভাবে জীবিকা অর্জন ক'রতে পারবেন। শহরের ক্ষুদ্র শিল্পে সকলের জীবনের মানই এইভাবে বর্ধিত হবে। একসূত্রে বাঁধা প'ড়বে এই কেন্দ্রীভূত উপনগরী ও তার চারিদিকে বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল। দু'য়ে মিলে এক শাসন ও অর্থনৈতিক তন্ত্রের সৃষ্টি ক'রবে। উপনগরীর জনসংখ্যা হবে পাঁচ হাজার আর তার অন্য অঙ্গ, বিস্তৃততর গ্রামাঞ্চলের সংখ্যা হবে পঁচিশ হাজার। উপনগরীতে ঔষধপত্র বিতরণ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ও পেশা শিক্ষণ কেন্দ্র, পশুপক্ষীর চিকিৎসা, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি ও ফলের চাষ, পক্ষী পালন, শূকর উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, ভেড়া পালন ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত থাকবে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনেরও উপকেন্দ্র এইখানে থাকবে যাতে করে গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো পৌছতে পারে। এই উপনগরীতে আরো নানান বন্দোবস্ত থাকবে। কুটীরশিল্প, বিজলীকেন্দ্র, আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত, পাঠাগার, নাটক ও গান বাজনার সর্বরকম সুবিধা এখান থেকেই পাওয়া যাবে। কৃষি, পশুপালন, গ্রাম শিল্প, গ্রামীন ইঞ্জিনীয়ারিং, মহিলা ও শিশু মঙ্গল বিধান ও সমবায় কাজের ভিত্তিতে বিরচিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের আখড়া হবে এই উপনগরী। গ্রামের বিদ্যালয়টি হবে সমাজের প্রাণকেন্দ্র। সবাই জড় হবেন এখানে, যখন প্রয়োজন হবে। প্রতিটি ইস্কুলের সঙ্গে কিছুটা ক'রে জমি ধ'রে দেওয়া হবে। সেই জমিতে মাষ্টারমশাই চাষ ক'রবেন ছাত্রদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। কৃষি, পশুপালন ও স্থানীয় শিল্পের কাজ বৈজ্ঞানিক সম্মতভাবে ইস্কুলেই শেখানো হবে। আজকে সামূহিক

বিকাশ আন্দোলনে গ্রামসেবকের যে দায়িত্ব মজতুর মঞ্জিল পরিকল্পনাতে ইস্কুলের শিক্ষককে সেই দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছিল।

এদেশে গ্রামের তো অভাব নেই। অভাব ছিল সেই জনপদগুলিকে নতুন সমাজের আগতদিনের চাহিদা মেটাবার মত ক'রে গ'ড়ে তোলার।

এই উপনগরীটির যে সৃষ্টি হবে সেটিকে অবশ্য নতুন ক'রে বসাতে হবে। এখানকার বাসিন্দাদের উদ্বাস্ত তাঁবু-শহর থেকে বেছে এনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। চারিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক এলাকাটিকে বৃহত্তর এক পরিকল্পনার মাধ্যমে গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে ক'রে সেখানকার দৈনন্দিন ও দূরবর্তীকালীন সর্বরকম চাহিদার পূরণ ক'রতে পারা যাবে। যত সক্ষম ব্যক্তি আছেন সকলে জীবিকা অর্জনের মত কাজ পাবেন। নতুন কারিগরিতা শিখবার বন্দোবস্ত থাকবে সেখানে। নতুন পেশা শেখানোর সুযোগ সুবিধারও অভাব হবে না। পরিকল্পনাটিতে মোদ্দা খরচ হবার কথা ছিল দেড় কোটি টাকা। তার মধ্যে শহর গঠনে খরচ হবে ১ কোটি, আর বাকী টাকাটা লাগবে পল্লী অঞ্চল পুনর্গঠনের কাজে।

পুনর্গঠন ও পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ চলে জেলা সংগঠনের মাধ্যমে, আর তহশীল থেকে সাধারণতঃ রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলারক্ষার কাজ চালানো হয়। মজতুর মঞ্জিলের পরিকল্পনাটির লক্ষ্য হ'লো প্রতি ৩০,০০০ জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি উপনগরী গঠন করা। এই উপনগরীর মাধ্যমেই এখানকার বাসিন্দাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালানো হবে। এখান থেকে সম্প্রসারিত হবে সহগ্রথিত গ্রামাঞ্চলে সর্বরকম সুখসুবিধা। এই বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন শাসনব্যবস্থায় পুলিশের স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়নি। যারা কাজ খুঁজছেন তাদের কাজ যোগাড় করে দেওয়া হবে এইটাই বড় কথা। সমস্ত উপনগর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা এক বৃহৎ যুক্তপরিবারের মধ্যে যেন বাস ক'রবেন, এই রকম পরিস্থিতিতে যাঁরা বারবার অসামাজিক কাজ করার দায়ে যুক্ত হবেন, তাঁদের পুলিশের বেটনের তলায় বা জেল অধিকারকের হাতে সঁপে দিলে হবে না, তাদের পাঠাতে হবে সায়কিয়াট্রিক্টের কাছে। তাই মজতুর মঞ্জিলের ছ'কে পুলিশের স্থান রাখিনি। অধিবাসীবৃন্দের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য থাকবে, সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ হবে সে মতবিরোধের, আর পঞ্চায়েত ক'রবেন সে বিরোধের উপর যথাযোগ্য ফয়সলা। অর্থনৈতিক কাজকারবার

যা তা সবই চ'লবে সমবায়ের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত ব্যবসা সেদিনকার পরিকল্পনায় স্থান পায়নি কোনও।

পুনর্বাসন দপ্তর এই পরিকল্পনাটি কাজে খাটাবেন। এই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই দপ্তরের আসল কাজ তো ছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের। তাই বৃহত্তর সংযুক্ত সংস্থার যে পরিকল্পনা, এদেশের আদি অধিবাসীদের উন্নয়নের কথা যাতে ভাবা হয়েছে, পরিকল্পনা দপ্তরের কার্যধারার মাধ্যমে সে বিষয়ে কিছু করে তোলা কঠিন ছিল। এতো তাদের কাজ নয়। আর শুধু উদ্বাস্তু পুনর্গঠনের জন্য গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ শুরু ক'রে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। তাহ'লে সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব তো বেড়েই যাবে, আদিবাসিন্দা যারা তারা পিছপা হ'য়ে প'ড়বেন। এক একবার মনে হ'লো মজদুর মঞ্জিলের পরিকল্পনা বুঝি শিকেয় তুলে রেখে দিতে হবে। তাই অন্ততঃ আগামী কিছুকালের জন্য মুখ ফিরাতে হ'লো অন্যত্র। নতুন উদ্বাস্তদের নিয়ে নতুন উপনগরী গঠন এই চাই, তাই হ'লো তখন প্রধান কাজ।

এই সময় শ্রীআলবার্ট মায়ার প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে আমাদের কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প পরিদর্শন ক'রতে এলেন। তিনি জাতিতে আমেরিকান, পেশা তাঁর স্থাপত্য শিল্প, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি একজন নিছক সমাজকর্মীমাত্র। তাঁকে আমার মজদুর মঞ্জিল পরিকল্পনাটি প'ড়তে দিলাম। তাঁর কাছে জানলাম যে উত্তর প্রদেশ সরকারের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থের নির্দেশে তিনি এখন এটোয়া জেলায় ৯৪টি গ্রাম নিয়ে একটি পল্লীপুনর্গঠন পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছেন। আমার সঙ্গে বেশ কিছুটা আলোচনা হ'তে হ'তে তিনি ব'লে উঠলেন যে এটোয়ার এই কাজে আমাকে সহকর্মীরূপে পেতে চান। ঠিক আমার মতই একজনের সন্ধান তিনি ক'রছিলেন। এতদিনে পেয়েছেন। বিনীতভাবে তাঁকে তখন আমি নিবেদন ক'রলাম যে আমিও আমার নিজের খামখেয়ালী নেশায় ঐ ধরনেরই এক পরিকল্পনা আবিষ্কারে লিপ্ত আছি। আরও জানালাম যে এই পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যসূচির পল্লীগঠন অংশটি নিয়ে তিনি কাজে নেমেছেন, আমার পক্ষে এ অতি আনন্দের কথা। এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে শহরাঞ্চলের কার্যভারের কথা আমি চিন্তা ক'রতে পারবো, যাতে ক'রে আমাদের উভয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলপ্রসূত অভিজ্ঞতা এক সংযুক্ত সামূহিক বিকাশের পথ বাৎলাবে। আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার নিয়োগ করা যাবে।

তখনও এটোয়া আর নিলোখেরির সৃষ্টি হয়নি—একই অঙ্গের দুই অভিন্ন প্রত্যঙ্গ হিসাবে হাতে হাত মিলিয়ে তাদের একত্রিত পরীক্ষা তখনও শুরু হয়নি। মজদুর মঞ্জিলের ভাবরূপে নতুন ভারতবর্ষের নয়া সড়ক আঁকা তখন হ'য়ে গেছে।

ঠিক এই সময় দিয়েই পরিকল্পনা দপ্তরে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতি নির্ধারণের চেষ্টা হ'য়েছিল। ভ্রূণ অবস্থাতেই এই পরীক্ষাটি অবশ্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। তবু স্বল্প কথায় হ'লেও এই বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ ক'রছি। উদ্বাস্তু পুনর্গঠনের জন্য অগণ্য জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি মিটাবার জন্য যা শক্তি সামর্থ্য লাগে ভারত সরকারের কোন একটি বিশেষ মন্ত্রণালয়ের হাতে সে ক্ষমতা ছিল না ব'ললেই হয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমগ্র দেশজোড়া এক বিরাটতর পুনর্গঠন আন্দোলনের পরীক্ষা করা যেতে পারে সরকারের কাছে এ ব্যাপারটাও বোধহয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। এও বোঝা গিয়েছিল যে চারিদিকের সমাজ থেকে আলাদা ক'রে শুধুমাত্র উদ্বাস্তুদের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের একাঙ্গভুক্ত ক'রতে হবে, আর তার মধ্য দিয়েই আসবে তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসন। এরকম পূর্ণাঙ্গ উন্নতির কাজ যে একটি মাত্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ ক'রতে পারে না। অন্য বহু মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে তাকে নাক গলাতে হবে, আর তাতে সমাধানের চেয়ে সমস্যাই সৃষ্টি হবে বেশি—সে কথাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাই সৃষ্টি হ'লো ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে সংগঠিত পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বোর্ড। এই সংস্থাটির হালের কাজ যদিও হ'লো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। এর প্রসারিত দৃষ্টি সমস্ত ভারতবর্ষ পুনর্গঠনের কাজে স্থাপিত হবে এই রকমই কথা ছিল। মহৎ, বৃহৎ ও সর্বব্যাপী এই পরিকল্পনা কিন্তু একটিমাত্র, ক্ষুদ্র, তিনজন মেম্বার পরিচালিত সংস্থার পক্ষে এঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব ছিল। তখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি যে ভারতবর্ষের অগণ্য সমস্যা-গুলির কণ্ঠরোধ ক'রতে হ'লে ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রণালয়গুলিকে একযোগে কাজ ক'রতে হবে। এই তো ছিল পরিস্থিতি। আরও জটিলতর হয়ে গেল এরূপ যখন পরিকল্পনা দপ্তরের অফিসাররা বদ্ধপরিকর হ'লেন যাতে এই নতুন সংস্থাটি কিছুতেই মাথা চাড়া না দিয়ে উঠতে পারে তাই দেখবার জন্য। পুনর্বাসন দপ্তরের গায়ে এতটুকুও আঁচ না লাগে

এই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার দেহ থেকে এই হোল তাঁদের আশঙ্কা। কথা হ'লো এই নতুন সংস্থার প্রতিটি কার্যতালিকা ও নির্দেশ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনাধীন হবে। সাদা কথায় ব'লতে গেলে এই সংস্থা যা কিছু ক'রবেন বা একবার হাঁ ক'রতে হ'লেও দপ্তরের ক্ষুদ্রতম কেরানীটির নোটাঘাতে জর্জরিত হ'তে হবে তাকে। সংস্থার দর্প খর্ব করার সবচেয়ে বড় দাওয়াই হিসাবে জুড়ে দেওয়া হ'লো সংস্থার সেক্রেটারী হিসাবে একজন অল্পবয়স্ক আই, সি, এস অফিসারকে। তখন তিনি পদমর্যাদায় সবেমাত্র একজন আণ্ডার সেক্রেটারী। সরকারী কাজে কোন একটি সংস্থার সেক্রেটারীর মর্যাদা দিয়েই বোর্ডের মর্যাদা নিরূপণ হয়, কাজেই এই এক দাওয়াইতেই সংস্থার দফা খতম।

তখন উদ্বাস্তু সমস্যার ভার হৈ হৈ ক'রে বেড়ে চলেছে। নতুন বোর্ডের সামনে অনেক সমস্যা। কাজে নামতে হবে তাদের। সর্বপ্রথম সেইটাই ছিল দরকারী। কিন্তু কাজের কথা ছেড়ে বাক্যবাণে তাঁরা তখন জর্জরিত, আলোচনায় নিমগ্ন। মন্ত্রণালয়ের হাতে খেলছেন তাঁরা। তাঁরা বুঝেছেন যে সংস্থার দফা রফা করাই মন্ত্রণালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই প্রতি কথায় তাঁরা মান হারাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যা সামলাতে পারেন তার অনেক অনেক বেশি কাজ হাতে নিতে তাঁরা উদগ্রীব। মন্ত্রণালয়ের অফিসাররা একাজে বিশেষ পটু। তাই যখনই সংস্থাটির তরফ থেকে বলা হ'য়েছে যে কোন একটি বিশেষ ব্যাপার মন্ত্রিসভার হাত থেকে তাঁদের হাতে আসা উচিত তখনই মাথা নেড়েছেন মন্ত্রিসভা। বিনাবাক্যে কয়েক শ' ফাইলের বোঝা এগিয়ে দিয়েছেন বোর্ডের হাতে। কাজ ক'রবেন কি, ফাইলাঘাতে জীর্ণ কাগজের মধ্যে মুখ লুকিয়েই মেম্বারদের দিন কেটে যেতে লাগলো।

সংস্থা কাজে নেমেই কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে আমার কার্যাবলীর উপরে পর্যবেক্ষণের ভার চাইলেন। ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ তখনই বুঝে গেছি নর্থ ব্লক সেক্রেটারিয়েটের বন্দী এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে আসার ফল যে কি হবে। আমি বললাম—"মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেই সরাসরি কাজ চালাতে চাই। সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে যেতেও আমার আপত্তি নেই যদি অবশ্য বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সমভাবে কাজ করবার মর্যাদা আমাকে দেওয়া হয়।" পণ্ডিতজী রাজী হ'য়ে গেলেন। সংস্থাটির অবৈতনিক সদস্যরূপে

আমাকে নিয়োগ করা হ'লো। সংস্থার সেক্রেটারীর মাধ্যমেই আমি কাজ চালাতে লাগলাম। যতদিন সংস্থা জীবদ্দশায় ছিল ততদিন তাঁরা আমাকে শত হস্ত দূরে রেখেছিল। এর একটি মিটিং-এও আমার ডাক পড়েনি, কোন ব্যাপারেই আমার কাছে এতটুকু সাহায্য চাননি তাঁরা। সংস্থা আর মন্ত্রণালয়ের মধ্যে হানাহানি কিন্তু কমেনি। ৮০ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন ক'রতে হবে সেদিন। বিভক্ত গৃহ নিয়ে মন্ত্রণালয় একাজে এঁটে উঠতে পারে নি, তাই ঘটলো যা ছিল ঘটবার। সৃষ্টির ছমাসের মধ্যেই সংস্থার ইতি রফা। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সব কাজের ভার আবার যেমন ছিল, আর মন্ত্রণালয় যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনি তাঁদেরই হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়লো ! এর জন্য এতদিন চেষ্টারও ত্রুটি করেননি তাঁরা। ভারতবর্ষের পুনর্বাসনের ইতিহাসে তার প্রথম ও পরম গরিমাময় এক অধ্যায়ের এই হলো পরিসমাপ্তি।

## ॥ জলা জায়গায় লড়াই ॥

কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে তিনি স্বয়ং এসেছিলেন। পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছেন তিনি। তাই জহরলালজী সেদিন এই কার্যধারাটিকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চান। কোন বাধা যেন এর সামনে না আসে। একাজে টাকা খাটাতে তিনি প্রস্তুত, যদি সব অর্থ ব্যয় হ'য়েও যায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কে পারে তাঁকে ঠেকাতে। তবু কত ফিসফিসানি সমস্ত নর্থব্লক ধরে, পুনর্বাসন দপ্তরে কত কথা! আমি অজ্ঞাত কুলশীলব্যক্তি, কেন যে এমনিভাবে প্রেমের শ্রম দিতে আমি এগিয়ে এসেছি, কাজ করছি অথচ পয়সা নিচ্ছি না, কে জানে। সরকারের এত টাকা আমি লোকটাকে দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ উঠেছে। কে আমি? দুঃসাহসী রাজনীতিবিদ্, না পয়লা নম্বরের ঠগ কিংবা বাতুলমাত্র? সরকারের টাকা নিয়ে চম্পট দেবো না তো? আর যদি আমি যা ক'রতে চাই তা ক'রে উঠতে পারি তাহ'লে সরকারের কি হবে? পি, ডব্লিউ, ডি ডিপার্টমেণ্টের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাই তখন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মোদ্দা পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। এই সব ছ'কে বাধা স্কীমগুলির গতি কি হবে? আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এগুলি খতিয়ে ক'রে যাচ্ছেন তাদেরই বা কি দশা হবে? এসব কথা ওঠা তখন একান্তই প্রাসঙ্গিক ছিল।

পুনর্বাসন দপ্তরের দুর্দম সম্পাদক মশাই সেদিন আর নেই। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অফিসাররা যাঁদের হাতে সেদিন চাবি কাঠি ধরা ছিল তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু দিয়ে তৈরি। আমাকে নিয়ে কি ক'রবেন তাঁরা তখন ভেবে পাচ্ছেন না। আমাকে বাধা দিতে পারছেন না, তার কারণ প্রধানমন্ত্রীর নজর আমার পরিকল্পিত স্কীমগুলির উপরে ছিল। অথচ আমার সঙ্গে হাত মেলাতেও ভয়। তাই দিন কেটে যেতে লাগলো, আর অন্যান্য ফাইলগুলি ঘুরতে লাগলো ডেস্ক থেকে ডেস্কে। অবশেষে উপনগরী গঠনের স্কীমটি মঞ্জুর হ'য়ে গেল। প্রথম কিস্তিবন্দীর পাঁচ লাখ টাকাও মঞ্জুর। মোটামুটি এটাও পরিষ্কার ক'রে দিলেন তাঁরা, বাকী কিস্তির টাকা তখনই দেওয়া হবে যখন প্রারম্ভের মোটামুটি কাজগুলি সেরে ফেলতে পারবো। ঠিকই তো, বেশি ঝুক্কি নিতে কে

আর সাহস পায় বলুন ? আমার রকম সকম দেখে তবেই বাকী টাকার ঝুলি খুলবেন। টাকার অনটন—কাজের দিকের এই প্রথম বাধাটা ঘুচলো। এরপরে চারিদিকে তাকালাম। চাই একটা ভালরকমের জায়গা জমি।

কি করে কি ক'রতে হয় মোটামুটি আমার জানা ছিল, আর কি অবস্থার মধ্যে বাস করছিলাম তাও আমার অজানা ছিল না। যদি বাঁচতে হয় তাহ'লে যেসব শত্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি তাদের বেগকে হারিয়ে দিতে হবে। কিন্তু জমি কি ক'রে সংগ্রহ করা যায়—কোন সরকারী সংস্থা বিশেষজ্ঞর মাধ্যমে বা রাজ্য সরকারী সংস্থার কৃপায় তা আমার একেবারেই জানা ছিল না। উপনগরী তৈরির জন্য জমি খুঁজে বার করতে যে এত অসুবিধা হবে আগে বুঝিনি। পূর্ব পাঞ্জাব সেদিন চ'ষে ফেলেছি। কোন গৃহস্থকে গৃহচ্যুত করে তার জমি নিতে চাই না। যে জমি চাই তা যেমন তেমন হ'লে চলবে না। আধুনিক জনসংখ্যাকে আশ্রয় তো দিতেই হবে। প্রতিষ্ঠানটি যখন বেড়ে উঠবে তখনও যাতে জায়গার ঘাটতি না পড়ে তাও দেখতে হবে। চাষের মত জমি অথচ পতিত প'ড়ে আছে এমনি হ'লে ভাল হয়। চার পাশের গ্রাম থেকে আগন্তুক যানবাহনের চৌমাথার কাছাকাছি হ'লেই ভাল হয়। সুগঠিত শহর ও ব্যবসাকেন্দ্রের আওতার বাইরে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এমনি একটা জায়গা চাই। এমনি একটা জায়গা পাওয়া বড় সহজ ছিল না। পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের অবস্থা তখন নড়বড়ে আর বহু লোকে বহু ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারের উপরে তাদের প্রভাব অপরিসীম আর সর্বভুক তাদের ক্ষুধা। অনেক জায়গা দেখলাম। বললাম, এগুলো হ'লে ভাল হয় কিন্তু কোন না কোন ছুঁতো করে সব কিছুই সরিয়ে নেওয়া হ'লো। অন্ধ গলিতে পথ পাইনি সেদিন। পাখা ঝাপ্টে ঝাপ্টে ফিরেছি, পাঞ্জাবের একদিক থেকে আর একদিক, আর ক্ষমতায় যারা সেদিন আসীন, তাঁদের দরজায় দরজায় ঠুকেছি আমার মাথা। শেষকালে সেই প্রধানমন্ত্রীর কাছেই যেতে হ'লো। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের চেহারা একটু বদলালো। দিল্লী থেকে আম্বালার পথে পঁচাশিতম মাইল পোস্টের সামনে একখণ্ড জমি পেলাম। জলা জায়গা ইভাকুইর জমি, লম্বায় চওড়ায় ৫৫০ একর।

একটা গোলমত জায়গা, বৃষ্টির জলে সর্বপ্রথম এইখানে এসেই জমা হয়। প্রায় পঞ্চাশ মাইলের জল এখানে এসে ভর্তি হয়। ধক্ গাছে

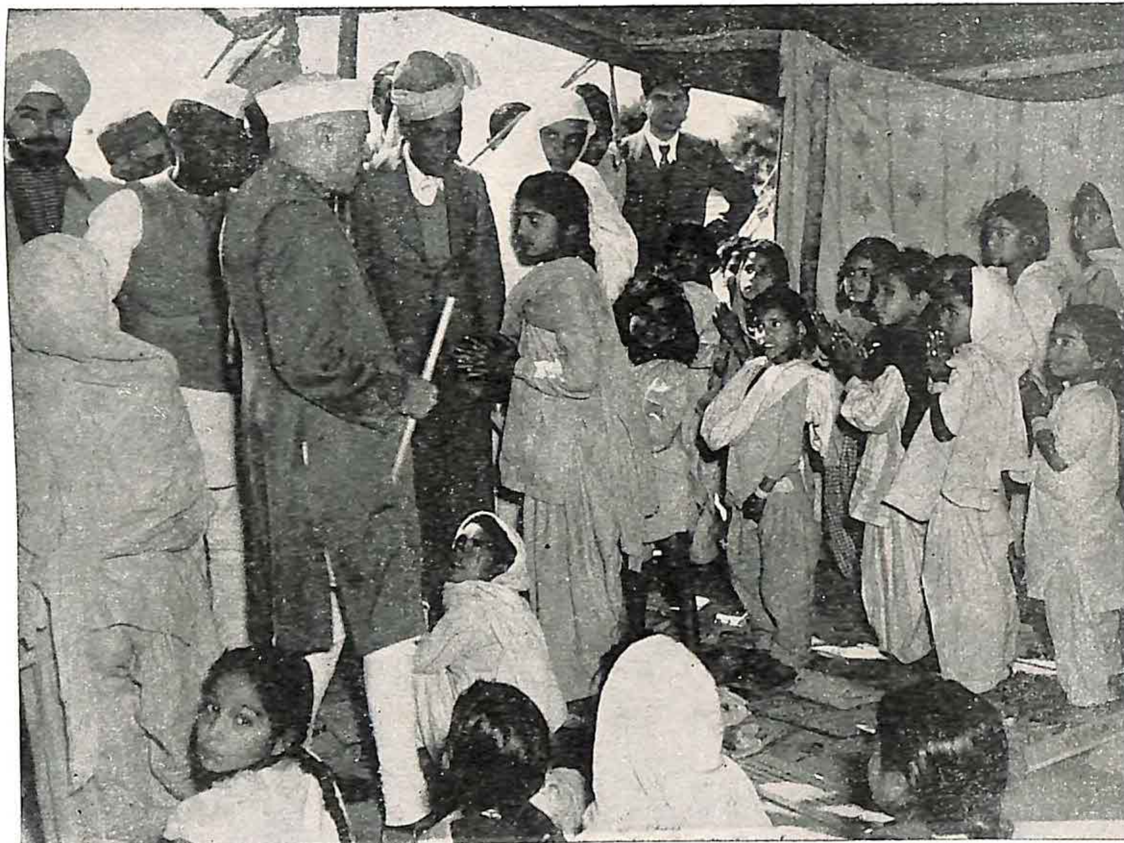
ভরা, ঝোপজঙ্গলাকীর্ণ জলাজমি—শূয়োর আর শিয়ালে ভরা—সাপের চাষ হয় বললেই চলে এখানে। বছরের অধিকাংশ সময়ই জলে ভরা থাকে জায়গাটা। তাছাড়া এখানটায় আগে ডাকাতের বাসভূমি ছিল বললেই হয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের জনহীন পথে তারা ওত পেতে থাকতো। তারপর আশ্রয় নিত এখানে। এই ৫০০ একর জমি ছাড়াও আশেপাশের গ্রাম থেকে আরও ৫।৬০০ একর পতিত অনাবাদি জমি পাওয়া যাবে ব'লে মনে হ'লো। বহু বসন্ত প্রতীক্ষিত অভাগা সমর্থ স্ত্রীলোকের মত অবস্থা তখন আমার। কানা হোক, খোঁড়া হোক স্বামী একটা পেলেই হ'লো, মালা সাজিয়ে ব'সে আছি কিনা। যে কোন জমি পেলেই আমি ঝাঁপ দিয়ে নিতে প্রস্তুত, কারণ দেরি আমার তখন সহ্য হ'চ্ছে না। আরও প্রতীক্ষা ক'রলে সব পরিকল্পনাই বানচাল হ'য়ে যাবে। জমিটার দখল নিয়ে নিলাম। ভারত সরকারের তরফে আমার নামে হাতবদল হ'য়ে গেল জমির মালিকানা।

মজদুর মঞ্জিল স্কীমটি যখন প্রথম তৈরি হয়—তখন শিক্ষণকেন্দ্রের সব সহকর্মীরা আর অন্য সকলেই আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভেবেছেন এতদিনে একটা মাথা গোঁজার ভালরকম ঠাঁই হবে। ছেলেপুলে নিয়ে বাস ক'রতে পারবেন। তাই জমির সন্ধানে যখন এদিকে ওদিকে মাথাকুটে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, তাদের সব প্রার্থনা আমাকে পথ দেখিয়েছে। কিন্তু আজ অবশেষে জমিটা যখন হাতে এল, এর রূপ দেখে হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল যেন সকলেরই। মজদুর মঞ্জিল পরিকল্পনায় তখনও তাঁদের ভরসা ছিল, কিন্তু তাই ব'লে কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প ছাড়তে তাঁরা তখনও একান্ত নারাজ। কারণ এখানে অন্ততঃ জনবল ছিল। তিনলক্ষ লোক একসঙ্গে বাস ক'রছিলেন। কোথায় যাবেন? "জঙ্গলের ভেতর শহর তৈরি হ'তে পারে কখনও।" স্বঅভিলাষী হ'লেও একটা বদ্ধপরিকর খেয়ালীর কথায় শেষটা ডুবতে বসবেন নাকি তাঁরা। তখন পকেটে আমার নিলোখেরির দলিল। সরকারের মঞ্জুরী পেয়ে গেছি। তবু এই এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'লাম। বেঁকে বসেছেন আমার সঙ্গীসাথীরা। যে পরিকল্পনা তুলে ধরেছি তাঁদের সামনে, তার সত্যতা কি করে প্রমাণ ক'রবো যদি না হাতে কলমে ক'রে দেখাবার সুযোগ পাই? আমার সহকর্মীদের কি ক'রে বোঝাব যদি না তাঁদের ফল দেখিয়ে বোঝাবার সুযোগ পাই। তাঁবু-শহরের অধিকাংশই এর

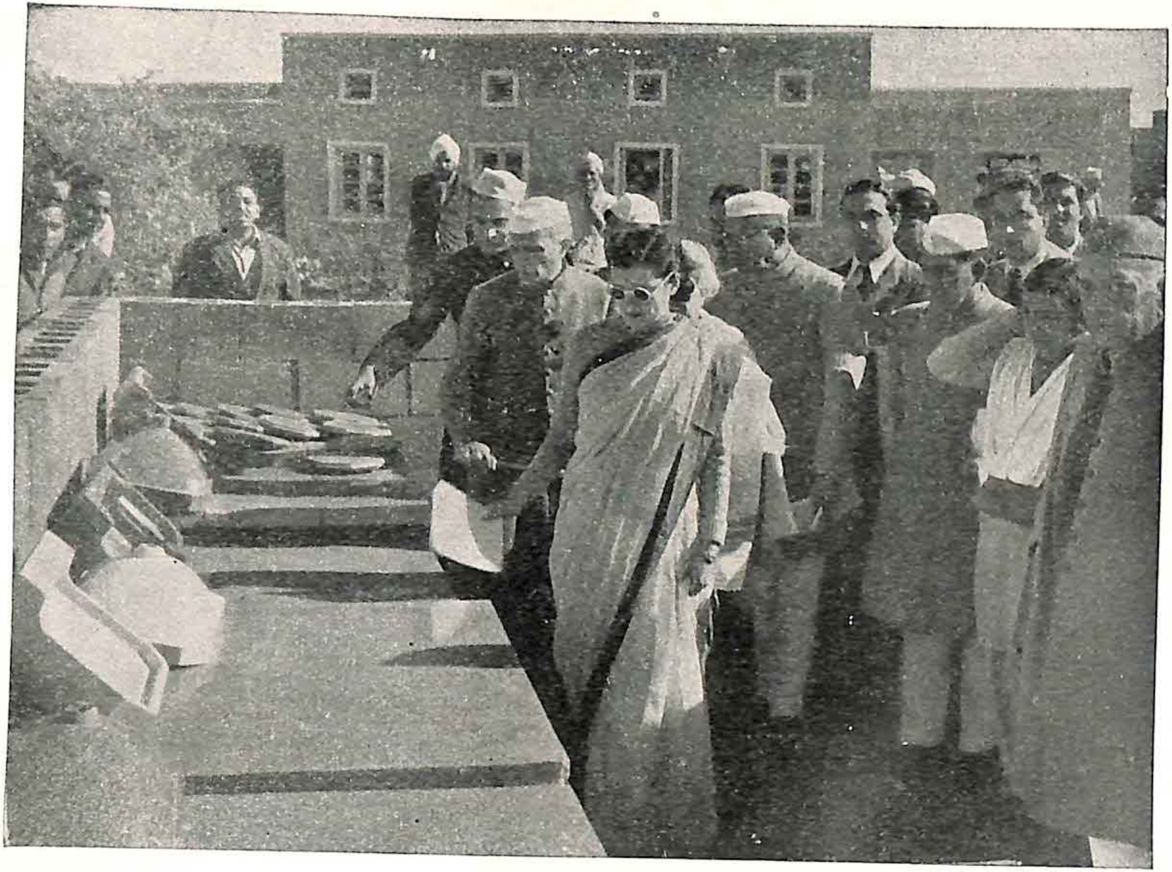
বিরুদ্ধে ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সেই শক্ত মানুষগুলির কাছে এই সত্য বুঝি প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, নিলোখেরিতে গিয়ে সাফল্য অর্জন ক'রতে হ'লে কঠিন পরিশ্রম ক'রতে হ'বে। রিলিফ ও বিনাপয়সার সাহায্য যা আসছে তারও ইতি শুরু হ'য়ে যাবে।

এই চরম পরিস্থিতিতে ভাগ্য পথ দেখালো। দিল্লীতে এসেছিলাম কিছু কেনাকাটা ক'রতে। টেলিফোনে খবর পেলাম যে সকাল থেকে কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে অনবরত বৃষ্টি হ'য়েছে। পেশাশিক্ষণ কেন্দ্রে জল দাঁড়িয়েছে তিন ফুট। তাঁবুগুলি ছিন্ন ভিন্ন হ'য়েছে অনেক জায়গাতে। কেন্দ্রের কার্য, দ্রব্যাদি, কাঠ ও আসবাবপত্রের বহুলাংশই ভেসে গেছে। তক্ষুনি ফিরে এলাম। এ তো বিপদ নয়—স্বর্গের আশীর্বাদ। এ সুযোগ গ্রহণ ক'রতেই হবে। শিক্ষণ কেন্দ্রের বাসিন্দাদের তখন দুটি পথ খোলা ছিল—হয় নিলোখেরিতে চ'লে আসবেন, নয়তো ঐ তাঁবু-শহরেই আবার সব কিছু নতুন ক'রে বানাতে হবে। তাঁবু-শহরের পুনর্নির্মাণের কাজ ক'রতে আমি একেবারেই রাজী হ'লাম না। বললাম, আমি কোদাল হাতে নিয়ে সবার সঙ্গে কাজ ক'রতে রাজী আছি যদি নিলোখেরিতে তাঁরা এসে দাঁড়াতে রাজী থাকেন। এ প্রস্তাবে কেউই রাজী হ'লেন না। কলকাতা থেকে সেদিন আমার এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন। ছিলেন আমার সঙ্গে। আমরা দুজনে নিলোখেরিতে চ'লে এলাম আর তাঁবু গেড়ে দিলাম নতুন বাসভূমিতে। যা হবে হোক, এখানেই থাকতে হবে চিরকাল।

তখনও চ'লেছে অবিরাম বৃষ্টি। উঁচু ডাঙ্গার উপরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের কাছাকাছি কিছুটা জমি পরিষ্কার ক'রে নিলাম। তৈরি হ'লাম রাত্রিবাসের জন্য। সাপ আর বন্য জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখলাম। পরদিন যখন ভোর হ'লো, দেখি তাঁবু-শহর থেকে কয়েকজন এসেছেন আমরা প্রাণে বেঁচে আছি কিনা তাই দেখতে। আমাদের হাসি দেখে তাঁরাও হেসে উঠলেন দরদ ভরে। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা তাঁবুর প্রায় পাঁচশ বাসিন্দাকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে নতুন জমিতে এনে ফেলতে পারলাম। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁবু থেকে আনা কিছু ক্ষয়ে যাওয়া টিন আর গোল গোল কাঠের গুঁড়ি কেটে কতগুলি চারিদিক খোলা ছাউনি গ'ড়ে দিলাম। চারিদিকে অনেক তাঁবু প'ড়ে গেল—লোকদের



প্রধানমন্ত্রী নেহরু একটি তাঁবুর স্কুল দেখছেন



প্রধানমন্ত্রী এখানকার তৈরি জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখছেন

বাসস্থান ও পেশাশিক্ষণ কেন্দ্রে ও অন্য কর্মকেন্দ্রটি আশ্রয় পেলো এই সব আস্তানায়। এই দুটি কেন্দ্রকে ঘিরেই তো বৃহত্তর পরিকল্পনাটি রূপায়িত হবে। রাতারাতি আমাদের বাসস্থানের আশেপাশে যত জঙ্গল ছিল তা নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেললাম। কতগুলি হস্তচালিত পাম্প টিউবওয়েল লাগানো হ'লো। একটা তিন কিলোর জেনারেটরও এনে ফেললাম। রাত্রের অন্ধকারে এটা জলবে। তাঁবুবাসীদের নিঃসংশয় করবার এই পথ।

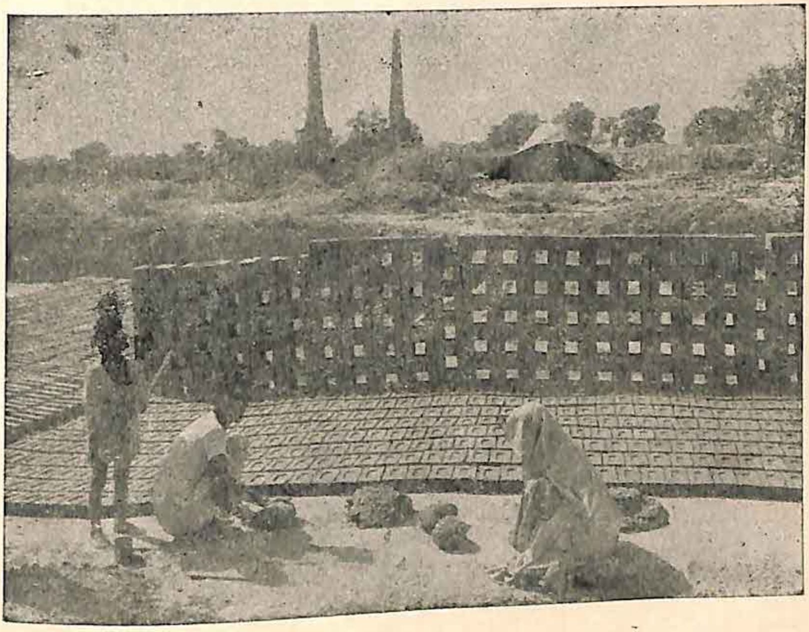
১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি নিলোখেরিতে আমরা অবতীর্ণ হ'য়েছিলাম। একমাস যেতে না যেতেই চারপাশের জলা জায়গায় দ্রুতগতিতে গ'ড়ে উঠলো একটি তাঁবু ঢাকা উপনগরী, ঝলসে উঠেছে বৈদ্যুতিক আলো, চোখে ভ্রম ধরায়। বুঝি স্থায়ী নগরীর পত্তন হ'য়ে গেল। বহু দপ্তর বসে গেছে, এখানে সেখানে তাঁবুতে। কাঠ আর প্যাকিং বাক্সগুলি দিয়ে বানানো অফিস ঘরে কান পাতলেই শোনা যায় চারিদিকে গুঞ্জরিত পেশীসংগীত। আহা কি মধুরই না লাগে! কিন্তু তবু অস্থায়ীয়ত্বে, অনিশ্চয়তায় চারিদিক অবসন্ন। যা কিছু গড়া হয়েছে এই জলা জায়গায়, মনে হয় একটা দুরন্ত ঝড়, কাঠ থেকে ফিনকি দিয়ে ওঠা একটা আগুনের ঝলক বা কোন একটা সাইক্লোন রাতারাতি সব কিছু ধুয়ে মুছে দেবে, মায় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক এই তিন কিলো জেনারেটর অবধি। স্থায়িভাবে কিছুই তো গ'ড়ে তুলতে পারিনি এখনও। সম্বল কিই বা ছিল। এঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার, রাজমিস্ত্রি, ইট, সিমেণ্ট যা কিছুর ভিত্তিতে একটি স্থায়ী সৌধ গ'ড়ে তোলা যায় তার কিছুই তো ছিল না সেদিন। এরই মাঝে এই কাজে সি, পি, ডব্লিউ, ডি'র একজন তরুণ টাউন প্ল্যানারকে কিন্তু উৎসাহিত ক'রতে পেরেছিলাম। সে আমাদের পথ দেখালো। রঙে এঁকে ভবিষ্যৎ উপনগরীর একটা খসড়া খাড়া ক'রে তুললো। উপনগরীর কেন্দ্র ভূমিটি এই খসড়ায় সে বসালো বন্যা অধ্যুষিত অঞ্চলের আওতার বাইরে। টিটাগড় আর্মি ডিসপোজাল ক্যাম্প থেকে বহু টিন ইত্যাদি পেয়েছিলাম। এইগুলি দিয়ে উপনগরীর প্রথম স্থায়ী কাঠামো গঠন করে ফেললাম।

কাল'কে জয় করার জন্যে দৃঢ় চিত্তে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাজ ক'রে চ'লেছি আমরা। এক মাসের মধ্যে পেশী শিক্ষণ কেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্রটির আশ্রয় স্থল হিসাবে কিছু বাড়ি তৈরি হ'য়ে গেল। একটা পলিটেকনিকও

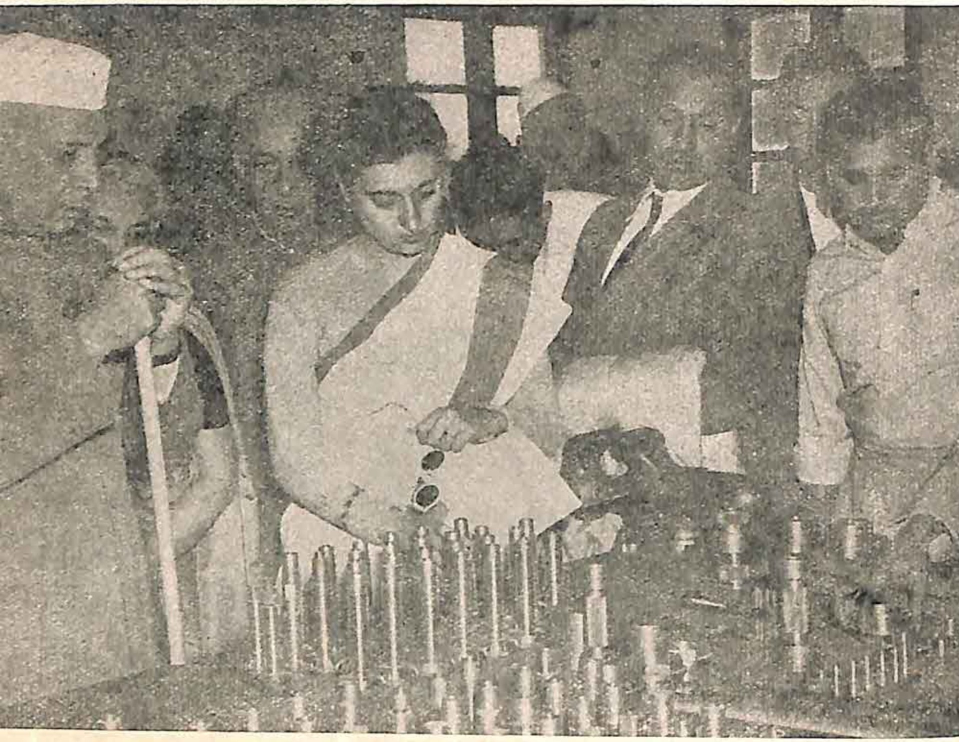
তৈরি ক'রে ফেললাম। এই উপনগরীর কাজে তখন আরও অনেক সুদক্ষ কর্মীর দরকার ছিল। রাজমিস্ত্রী, কামার, মেকানিক ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল মিস্ত্রী, ওভারসিয়ার, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, এ্যাকাউন্টেন্ট কত কিছুরই সেদিন দরকার। সরকারী যন্ত্রটা সেদিন যেমন আমার দিকে সন্দেহের চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিল, আমি তেমনি সেটাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা ক'রলাম। ঠিক করলাম মাত্র দুজন, একজন এ্যাকাউন্টেন্ট ও একজন অফিস ম্যানেজার ছাড়া কোন সরকারী কর্মচারী আমি নিয়োগ ক'রবো না। এই ক্যাম্পেই যাঁরা আছেন তাঁদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি ক'রে তুলবো এই কাজের উপযুক্ত ক'রে। উপনগরীর ভিত্তি প্রস্তর তখন স্থাপিত হ'য়ে গেছে। এর ক্রমবর্ধমান কাঠামোর দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্যে অনেক সুপটু ও মননশীল কর্মীর দরকার। নিলোখেরির কাজ শেষ হ'লেও জানতাম যে শিল্পকার, টেকনিসিয়ান ও অন্যান্যদের আমরা আজ তৈরি করে দেবো। অন্যত্র উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে তাদের প্রয়োজন থাকবে। দেশ পুনর্গঠনের বিরাটতর কাজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদের পলিটেকনিক এই কাজে লেগে গেল। ইটের আমদানি বাইরে থেকে করা চলে না, তাতে খরচ বেশি পড়ে, আর ইস্ট পাঞ্জাবে রাজমিস্ত্রীর তখন বড় অভাব। তাই ইট তৈরি আর রাজমিস্ত্রীর কাজ শেখানোর বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। তখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে, আমাদের বাসস্থানের জন্য ভূমি সংগ্রহ করার চেষ্টায়। যেসব জিনিস ফেলে দেওয়া দরকার ও জঙ্গলের যাবতীয় কাঠ কুঁটোতে আগুন জালিয়ে ইটের ক্লীন তৈরি করলাম। ক্লীন তৈরি হ'য়ে যাবার পরে ইট বেরোতে লাগলো। উপনগরীর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তখন আঁকা হ'য়ে গেছে। সি, পি, ডব্লিউ, ডির অক্লান্ত কর্মী আমার স্থাপত্য শিল্পী বন্ধু, আর একজন অত্যন্ত সুদক্ষ উপনগরী গঠনে পটু এঞ্জিনীয়ারকে সংগ্রহ করা গিয়েছিল। এঁদের দুজনের সহযোগিতা ও হাতে ইট—এই নিয়ে বাড়ির পর বাড়ি তৈরি ক'রতে শুরু ক'রে দিলাম। কর্মকেন্দ্রের মাথার ছাউনী থেকেই উপনগরীর একটা স্থায়ী স্থায়ী ভাব বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছিল। এর পরে ইউ, এস, ওয়ার ডিসপোজাল থেকে নিয়ে এলাম ৩০ কিলোর জেনারেটর। এর থেকে আলো পাওয়া গেল, পাওয়া গেল জলাভূমিতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা নতুন উপনগরীতে বৈদ্যুতিক শক্তির সন্ধান। পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রে বাড়ির চাকরদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি ক্লাশ খোলা



তাঁবুর জীবনযাত্রা



ইটখোলা





প্রধানমন্ত্রী উপনগরী দেখছেন

হ'লো। রুটি তৈরির বন্দোবস্ত শুরু হ'লো। প্রত্যেক তাঁবু-বাড়ির সামনেই তরকারির বাগান অবশ্য করণীয়রূপে আমরা গ্রহণ ক'রেছিলাম। খাদ্য সৃষ্টি হ'তে লাগলো। উপনগরীর বাসিন্দাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাবার জন্য একটি প্রকাণ্ড উপভোগ সমবায় শুরু ক'রে দেওয়া হ'লো। এ ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় খেলাধূলা, কুস্তির লড়াই, ভজন, কীর্তন ও ভাঙ্গরা নাচের বন্দোবস্ত তো ছিলই।

নিলোখেরিতে কুরুক্ষেত্রে স্থাপিত পেশা শিক্ষণ কেন্দ্র সরিয়ে আনা হ'লো ১৯৪৮ এর জুলাই মাসের শেষে। সেই হ'লো নিলোখেরির শুরু। তারপর থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৯ এর মার্চের আগে ( অর্থাৎ সরকারী বাজেট বছর শেষ হবার আগে ) যে যে কাজগুলি আমরা ক'রে ফেললাম তার একটা তালিকা এখানে জুড়ে দিচ্ছি—

১। বন জঙ্গল, ঝোপঝাড়ের বৃহত্তম অংশ সাফ করে ফেলা হ'লো।

২। সর্বসমেত ১১০ ফিট × ৯৫ ফিট মাপের চারটে কর্মকেন্দ্রকে আশ্রয় দেবার মতন বাড়ি তৈরি করা হ'লো। শিল্প, হস্তশিল্প, নাতিবৃহৎশিল্প ও পেশী শিক্ষণ কেন্দ্র এই বাড়িগুলিতে স্থাপিত হ'লো। নিলোখেরি আর নিলোখেরির মত অন্যান্য উপনগরী গ'ড়বার জন্য চাই মানুষ, আর সেই মানুষ তৈরির কারখানা হ'লো এই চারটি কর্মকেন্দ্র।

৩। অস্থায়ী ভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর বন্দোবস্ত করা গিয়েছে।

৪। অফিস ও অবাসিক আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত তাঁবু লাগানো হ'য়েছে। কর্মীরা সেখানে বাস করবেন।

৫। জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে ইটের ভাটি স্থাপিত হ'য়েছে।

৬। একটি ডেয়ারি, একটি পোলট্রি, একটি শূকর ঘরের গোড়াপত্তন করা হ'য়েছে।

৭। কৃষি ও ফল উৎপাদনের জন্য পতিত জমির উদ্ধার হ'য়েছে। মানবিক, জান্তব ও যান্ত্রিক ( tractor ) শক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় ফসল ফলানো শুরু হ'য়েছে এই সময়।

৮। আমাদের এলাকার অন্তর্গত অঞ্চলে ঘনতম জঙ্গল কেটে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সূচনা করা হ'য়েছে।

৯। উপনগরীর পরিকল্পনা শেষ হ'য়ে গেছে। রাস্তাঘাটেরও গোড়াপত্তন হ'য়ে গেছে।

১০। নিলোখেরির গঠনের কাজে লাগবে আর সেখানকার বিভিন্নমুখী কাজকর্ম চালাবার জন্য যা প্রয়োজন সেই অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুদক্ষ কর্মীর শিক্ষা সমাপ্ত করে ফেলা হ'য়েছে।

তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল শ্রী সি, রাজা গোপালাচারী টাউনশিপ দেখে গেলেন ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে। তার কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয়বার নিলোখেরি পরিদর্শন হ'য়ে গেল। উপনগরী গঠনের পরিকল্পনাটি আর আমাদের সম্মিলিত পেশী সংগীত রাজা গোপালাচারীর আগমনে পেলো বুক ভরা উৎসাহ। পণ্ডিতজীর অনুমোদন আবার আমাদের আশায় ভ'রে দিল। বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা এই দুয়ের ভিত্তি স্বরূপ যে ত্রয়ীমন্ত্রের কথা আগে বলেছি তার জলন্ত নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে প্রধানমন্ত্রী খুসী। নিলোখেরিতে সেদিন কেউ ভিক্ষা করেনি। সেখানে দালালী করেও কেউ জীবিকা অর্জন করেনি। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যেই এই একটা মাত্র জায়গায় তার প্রত্যেক অধিবাসীকে বাঁচবার, জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করার, আর যা অর্জিত হ'য়েছে তার পূর্ণ ফল গ্রহণ করার অধিকার তুলে দেওয়া হ'য়েছে। সরকারের এই নতুন কর্মচারীরা বিভিন্ন কাজে সেদিন গা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় নিঙড়ানো ঘাম সেদিন পড়েছে দরদর বেগে—সে শুধু টাকা রোজগারের জন্য নয়, এক দিব্য কর্ম করার সুখে। আমাদের এই সাফল্য ও প্রশংসা সেদিন বা ভবিষ্যৎকালে যে আমাদের সব অসুবিধা দূর ক'রেছিল তা মোটেই নয়। বাইরের প্রতিটি বাহবা পুনর্বাসনের কাজে লিপ্ত গতানুগতিক মননশীল ও অন্যান্য সকল ব্যক্তিরই চোখ টাটিয়েছে। এতে অর্থাৎ আমাদের সাফল্যে তাদের রাগ বেড়েছে বই কমেনি। যখন পেশা শিক্ষণ কেন্দ্র কুরুক্ষেত্র থেকে নিলোখেরিতে উঠে গেল, সেই সময় থেকে ১৯৪৯ এর প্রারম্ভ পর্যন্ত যেটুকু সময় হাতে পেয়েছিলাম, সেই সময় বুনিয়াদী কাজ করেছি। বৃহত্তর পরিকল্পনায় হাত দেবার আগে অস্থায়ী অনেক কাঠামো এই সময়ই খাড়া করা হ'য়েছে। ১৯৪৯-৫০ এর অর্থনৈতিক বছর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী উপনগরী গঠনের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হ'লো। যে টাকাটা চেয়েছি তার মঞ্জুরীমাত্র যে কিছুই নয়, গভর্ণমেণ্টের জ্ঞান কোষস্থিত ফাণ্ডামেণ্টাল রুল নেড়ে চেড়ে তার অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, টাকা হাতে পেতে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। রাজধানীর নাগরদোলায়

দোল খাওয়া বহু পণ্ডিতের সঙ্গে পাঞ্জা মিলিয়েছি সেদিন তবু অভিমন্যুর ব্যূহে ঢুকে পড়ার মত অবস্থা আমার। বাইরে বেরিয়ে আসার পথ যাদের জানা নেই, নাকানি চোবানি তাদের অবধারিত। বহুদিন কেটে যাবার পর, বহু রক্তকণা ও উপশিরার ক্ষয় হবার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'লো। তখন বুঝলাম যে সরকার থেকে কি কি বিশেষ ক্ষমতা হস্তগত ক'রলে তবেই কাজের মঞ্জুরী করানো যাবে, আর লোকের মুখ না হাসিয়ে টাকা খরচ করার মতন অর্থ ব্যবহার করা যাবে। নয়া রাজধানীতে কাজে লাগতে পারে যে ভানুমতীর খেল তা শিখতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল বইকি। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করানো গেল। আমি তখন মন্ত্রণালয়ের অবৈতনিক টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসাররূপে বেশ কিছু ক্ষমতা সংগ্রহ ক'রে ব'সেছি। অনেক লড়ালড়ির পর ঐ মন্ত্রণালয়েরই এক্স অফিসিও জয়েণ্ট সেক্রেটারী হ'য়ে গেলাম। এ না হ'লে সরকারের তরফে আমি নানান কাজে হাত দিতে পারছিলাম না। আরম্ভের পালা শেষ হ'লো। এর পর শুরু হ'বে কাজের পালা। এই আরম্ভটুকু শেষ ক'রতে গিয়ে আমার আর উপনগরীর অবস্থা যে কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল "মৃত-দেওয়াল" নামক নাটকটি প'ড়লেই পাঠক তা সহজেই অনুমান ক'রতে পারবেন। ( পরিশিষ্ট দেখুন )। ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হ'য়েছিল।

## ॥ চলার পথে সমাজসেবী রাষ্ট্র ॥

১৯৫০ এর অর্থনৈতিক বছর আরম্ভ হবার সময়টা দিয়ে নিলোখেরি উপনগরীর কাজকর্ম বেশ সাজানো গোছানো হ'য়ে গিয়েছিল। পেশী শিক্ষণ কেন্দ্র আর পলিটেকনিকে সরকারী অর্থে লালিত এই দুইটি সংস্থা হ'য়ে দাঁড়ালো আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ—শুধু আর্থিক দিক থেকে নয়, পরমার্থিক দিক থেকেও বটে। পেশা শিক্ষণ কেন্দ্রে আগেই বলেছি শিল্প ও কলাবিদ্যা ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য যা প্রয়োজনীয় তা প্রস্তুত করার শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। নিলোখেরির স্থায়ী বাসিন্দা যারা হবেন তাঁরা, আর কুরুক্ষেত্র, আর অন্যান্য ক্যাম্পের অধিবাসীরা ছাত্র পাঠাতেন এই শিক্ষা কেন্দ্রে। ইট তৈরি থেকে আরম্ভ ক'রে রুটি তৈরি অবধি, বোনা আর এমব্রয়ডারী থেকে আরম্ভ করে কুমোরের কাজ আর খেলনা তৈরির কাজ অবধি সবকিছু শেখানোরই বন্দোবস্ত ছিল। তা'ছাড়া পলিটেকনিকে নানারকম টেকনিক্যাল কোর্স, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ও এ্যাকাউন্টস ক্লার্ক ইত্যাদি সব রকম কাজ শেখাবার যোগানের অভাব ছিল না। তাত্ত্বিক তথ্য থেকে আরম্ভ ক'রে হাতে কলমে কাজ, আর হাতে কলমে কাজ ক'রে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, এই ত্রি-রূপই ছিল আমাদের শিক্ষণ বিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেদিন নিলোখেরির বিশেষ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই সময় পুনর্বাসন দপ্তর থেকে এই সব বিভিন্ন শিক্ষণ বিষয়গুলি যাতে একটা স্থায়িরূপ পায়, আর সেই রূপটা ঠিক কি হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একটা কমিটি নিয়োগ ক'রে দিলেন। আমাদের দুটি শিক্ষণ কেন্দ্রই এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নবরূপ পরিগ্রহ করলো।

এই শিক্ষণ কেন্দ্র দুটিতে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'তো তার পরিপূরক হিসাবে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়েই শিক্ষা প্রাপ্তির পর কর্মকেন্দ্রে কাজ যোগানর বন্দোবস্ত বসিয়ে দেওয়া হ'লো। সৃষ্টি হ'লো শিল্প বিভাগের। এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপ, যন্ত্র সম্বলিত সুতোর কারখানা, ট্যানারি আর প্রিন্টিং প্রেস এই হ'লো এই বিভাগের বিভিন্ন অঙ্গ। আমাদের উপনগরীর দৈনন্দিন অর্থনীতি পরিচালনের কাঠামোটাকে সুদৃঢ় করার জন্য তাঁত, ক্যালিকো প্রিন্টিং, সাবান

তৈরি, ধোপার কাজ, বেকারী, টিন ও কামারশালা, চর্ম প্রস্তুত কেন্দ্র এবং আরও অন্যান্য বহুরকম শিল্প কাজ শুরু হ'য়ে গেছে তখন। শিল্প বিভাগের কাজ হ'লো টেকনিক্যাল ও মেকানিক্যাল শিল্পগুলির দেখাশুনা করা! একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতাকরণ বিভাগের আওতায় ও অন্যান্য শিল্প ও কলার অনুবিভাগগুলি আর তাছাড়া কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলিরও কাজ চ'লতে লাগলো। উপনগরীর জনসমাজের, আর যতটা সম্ভব হয় আশে পাশে ছড়ানো গ্রামগুলিরও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা এই বিভাগ তাঁদের মুখ্য দায়িত্বরূপে গ্রহণ ক'রলেন। চাষের কাজ তো সেদিন খুব বেশি রকমই হ'তো, তাছাড়া একটি শূকর রক্ষণ কেন্দ্র, পক্ষী পালন কেন্দ্র, ও ফল ফলানোর বিভাগের সৃষ্টি করা হ'য়েছিল। উদ্দেশ্য এই কাজগুলি যেন ধীরে ধীরে আশে পাশের গ্রামে সম্প্রসারিত হ'য়ে পড়ে। চাষীর ছেলেকে সুদক্ষ চাষা ক'রে তোলার জন্য একটা এক বছরের কৃষিবিদ্যার কোর্স স্থাপিত করা হ'লো। উপনগরীতে সেদিন বনজঙ্গলের হাত থেকে সদ্যমুক্ত অনেক জমি এসে পড়েছে। এই জমির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার ক'রে এই কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষিত চাষীরা এখানকার প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু যাতে তৈরি ক'রতে পারেন সে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। চাষের জল যোগানোর জন্য টিউবওয়েল তখন বসানো হ'য়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে সে জল উঠছে সেই যন্ত্রশক্তি দিয়ে।

নবস্থাপিত কনষ্ট্রাকশান বিভাগের হাতে উপনগরী গঠন ক'রে তোলার ভার। এই বিভাগ তাদের প্রয়োজনানুসারে ইট, লৌহ দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্রের জন্য উপনগরীর প্রস্তুত কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কাজে প্রয়োজনানুযায়ী নিজেদের চাহিদা পেশ ক'রতেন। বিভিন্ন শিল্প বিভাগ থেকে যা কিছু প্রস্তুত হ'তো সে সব জিনিসপত্রের সবচেয়ে নাম করা খরিদ্দার হ'লেন এই কনষ্ট্রাকশান বিভাগ। যতটা প্রস্তুত হ'চ্ছে ও যতটা প্রয়োজন আছে তার মধ্যে এরকম ভাবেই আমরা একটা সাম্যের সৃষ্টি ক'রেছিলাম। এমন কি পলিটেকনিক ও অন্য প্রতিষ্ঠানটি থেকে যারা শিক্ষা নিয়ে বের হ'য়ে এলেন তাদেরও সহজেই লাগিয়ে দেওয়া গেল যে সব গঠনমূলক কাজ হচ্ছিল সেই সব কাজে। কাঁচামাল যা সরকার এবং বাইরের বাজার থেকে কেনার কথা, আর উপনগরীর উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি যার স্থানীয় চাহিদা নেই—শাসনতান্ত্রিক বিভাগের হাতে প'ড়লো এসবের দেখাশুনার ভার। একজন সুপটু হিসেব রক্ষক

ও অফিস ম্যানেজার, ঘর সংসারের নিয়ত বর্ধমান কাজ সামলাবার ভার নিলেন এই শাসনতান্ত্রিক বিভাগের মাধ্যমে। বাইরে বিক্রি ও বাইরে থেকে আমদানি এ দুই কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর প্রয়োজনে সেদিন। বিশেষ প্রয়োজনীয় অবশ্য কর্মরূপে এই দুই কার্যাবলী সেদিন গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের প্রথমে বিভিন্ন কাজে উপনগরীতে যারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের একটা মোটামুটি তালিকা এখানে তুলে ধরা যাক। ক্ষুদ্র, নাতিবৃহৎ ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন ৬২৫টি পরিবার, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৫০টি, কৃষি সংলগ্ন কাজে ৬০টি ও গঠনমূলক কাজে প্রায় ৯০০টি পরিবার কাজ পেলেন। সেই সময় যে সেন্সাস গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে প্রকাশ পেলো যে উপনগরীর শ্রমিকদের তখন মাথা পিছু মাসিক আয় ৭১·৫ টাকা। নিলোখেরির পলিটেকনিকে ততদিনে প্রায় ১৯০০ শিক্ষার্থী তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে। আরও ৫০০ জন তখন শিক্ষা পাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ২০০ জন, যারা আগেই শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরাও নিলোখেরিতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পাওয়ার হাউস, কুটীরশিল্প, ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ শিল্প, পলিটেকনিক আর শাসনতান্ত্রিক কাজে ( যথা—স্টেনোগ্রাফার থেকে হিসেব রক্ষক ইত্যাদি ) এদের সহজেই লাগিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। ১৯৫১-র সেন্সাসে প্রকাশ—সেদিন এই উপনগরীর জনসংখ্যা ৫৭৩১, আরও বাড়ছে। এই উপনগরীর বিশেষ করে গঠন বিভাগের কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আশে পাশের গ্রামের বাসিন্দা। পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অনেকেই তাদেরই মত চারপাশের গ্রাম থেকে এসেছিলেন।

শুধু অর্থ হ'লেই তো চলে না, তাই জনমঙ্গল বিভাগ একটা খুলে দেওয়া হ'লো। একটা প্রাকৃতিক উপায় চিকিৎসাকরণ কেন্দ্র স্থাপিত হ'লো। এছাড়া স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত ও অভিনীত একটি খোলা স্টেজের থিয়েটার, খেলাধূলা ও কুস্তির নানারকম বন্দোবস্ত এই জনমঙ্গল বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হ'তে লাগলো। লাগলো আনন্দের ছোঁয়া। দেশের নানা দিক থেকে অবৈতনিক কর্মী হিসাবে বহুসংস্থা থেকে হাত লাগালেন জনমঙ্গলের কাজে। অন্ধ মুক, স্থবির ইত্যাদির সেবার বন্দোবস্ত করার ভার প'ড়লো এই বিভাগের উপর, সমাজের দ্বন্দ্ব বিবাদও তাঁরাই মেটাবেন। সরকারী সাহায্যে স্থাপিত হ'লো বিভিন্ন ধরনের স্কুল নার্সারী থেকে হাইস্কুল অবধি।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও লেখা পড়ার পরে গঠনমূলক কাজ অর্থাৎ সব্জী বাগান ইত্যাদি করা এই স্কুলগুলিতে বিশেষ ক'রে শেখানো হ'তো। সব ছেলেমেয়ে যাতে স্কুলে আসে তার জন্য কত চেষ্টা—যে সব পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক অথচ রোজগার কম তাদের বিশেষ কতকগুলি স্থবিধার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হ'লো। ২৪টি বেড সম্বলিত একটি হাসতাপাল আর সেখানে ইনডোর সার্ভিস ও আউটডোর সার্ভিস এই দু'য়ের বন্দোবস্ত করতে কোন ত্রুটি হ'লো না। বাইরের গ্রামের লোকেরাও এই হাসপাতালের সাহায্য পেতে লাগলেন। ছুটির দিনে উপনগরীর লোকেরা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চার পাশের ময়লা ইত্যাদি সরাবার কাজে তৎপর হ'য়ে উঠতেন। জনস্বাস্থ্যের কাজ সেদিন সমাজ গঠনের পথে আমাদের এক বুনিয়াদী কাজ রূপে পরিগণিত হ'য়েছিল। ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি সরকার চালাতেন। সরকারই হ'লেন নিয়োগ কর্তা, আর যারা এই সব সংস্থায় কাজ ক'রতেন তাদের আবাস গৃহ, ভাল সরবরাহ, ইলেকট্রিসিটির বন্দোবস্ত ইত্যাদি সব সরকারই ক'রে দিতেন। যা কিছু উৎপন্ন হতো তার বিতরণের ভারও সরকারের উপর ছিল। উপনগরীর ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক সে সব কাটিয়ে দেবার ভার ওদেরই। উপনগরীর প্রত্যেক লোককেই কর্ম সংস্থান জুগিয়ে দেবার মত একটা পরিবেশের সৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল। আজকে পঞ্চবার্ষিক যোজনায় যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটের কথা বলা হ'য়েছে, অজানিতে নিলোখেরিতে বোধ হয় সেই পরীক্ষার প্রথম মহড়া শুরু হ'য়েছিল। উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ কলোনীতে সেদিন ভাল করেই শুরু হ'য়ে গেছে। কৃষি, পশু পালন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ছাড়াও পঞ্চায়েত ও সমবায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে সেখানে। বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য সমাজ শিক্ষা জোগানেরও ত্রুটি ছিল না। পরে সামূহিক বিকাশ আন্দোলনে যে সম্প্রসারণের কাজ দেখেছি আমরা, তারও শুরু এই নিলোখেরিতে। যে সব বহিরাঙ্গিক কাজগুলি চলছিলো তার সব কিছুর খরচা তো সরকারের বাজেট থেকে পাওয়া যেত না। তাই নিলোখেরির অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই সব মঙ্গল কাজ বিধানের পথ ক'রে নিয়েছিলেন। আজকের কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট ও কো-অপারেশন দপ্তরের মুখপাত্র 'কুরুক্ষেত্র' কাগজটি প্রথম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে নিলোখেরি থেকে প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ নাগরিকদের মনকে যে সব ভয়, ভরসা

ও ভাবনা সেদিন আন্দোলিত ক'রেছিলো তার প্রকাশস্থল হ'বে এই 'কুরুক্ষেত্র'। আবার ছাপাখানার ট্রেণিদের হাতে কলমে কাজ শেখানোর সুবিধা ক'রে দেওয়াও এর একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের উপনগরীতে পুলিশ ছিল না। কোন বড় একটা গোলমালও কোনদিন হয়নি। মনে পড়ে শুধু একবার সদ্য বিবাহিত ভদ্রলোকের বাড়িতে বাইরের থেকে এসে একদল ডাকাত হামলা করেছিল। সরকারী সাহায্যপুষ্ট নিলোখেরি সেদিন যেন ক্ষুদ্র এক সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতীক। এগিয়ে চলেছে সে রাষ্ট্র সরকারী অনুপ্রেরণার উপর ভর করে। কাজকর্ম যা গ'ড়ে উঠেছে তিলে তিলে তা সবই সরকারের অনুগ্রহে আর সরকারই দাঁড়িয়েছেন আবার মহাজনরূপে, ক্ষয় ক্ষতিটা সবই নীলকণ্ঠের মতন শুষে নিয়েছেন সেই সরকার। শহরে বেকার ছিল না। সেখানকার অধিবাসীরা যে সেদিন তাই কল্যাণ সরকারের উপরে বড় নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হ'য়ে প'ড়েছিল তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নিলোখেরির শাসনযন্ত্রটা সে দিন ভার নিয়েছে সকলের—যারাই কাজ করতে চেয়েছে তাদের কাজের যোগাড় করে দেওয়ার, জীবিকা জুটিয়ে দেওয়ার। "আরাম হারাম হ্যায়" প্রধানমন্ত্রীর এই ধ্বনি সেদিন নিলোখেরি উপনগরীতে বেদবাক্যের মত পালিত হ'য়েছে। কুটোটুকুও যা প্রস্তুত হচ্ছিল নিলোখেরিতে তার বিক্রির অভাব ছিল না, আর বিক্রি না হলে প্রস্তুত দ্রব্য শুষে নেবার দায়িত্ব ছিল শাসনতন্ত্রের। সাম্প্রদায়িক কলহ ছিল না, ছিল না রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। আদর্শ সমাজতন্ত্রের এ এক দ্বীপ। এর পূর্ণতম অর্থ-নৈতিক কাজ চালিয়েছে সাধারণ সমাজ পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলি। তবু যা কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা সবই স্বাধীন ভাবে ও পরনির্ভরভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। সরকারী ডাণ্ডা চালানোর প্রয়োজন সেদিন সেখানে ছিল না। শাসনতন্ত্রের পশু বলের প্রয়োগ এই উপনগরীতে অজানিত ছিল একেবারে।

"মা-বাপ" সরকার কতদিন চলতে পারে? উদ্বাস্তু যারা, স্থায়ী বাসিন্দার মত বাস ক'রতে তাদের একদিন শিখতেই হবে। নিজেদের কাজ শাসন-তান্ত্রিক ও অর্থ নৈতিক, একদিন নিজেদেরই ঘাড়ে তুলে নিতে হবে। অল্প-স্বল্প এদিক ওদিকের কিছু খরচা বাদ দিয়ে এই উপনগরী গঠনের যা কিছু মূল্য যা কিছু সুখ সুবিধা এমন কি জীবিকা অর্জনের জন্য যা অর্থব্যয় হ'য়েছে সেতো

একদিন ধর্ম বাপকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। নিলোখেরি নামক তত্ত্বটিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহ'লে এরকম আরও বহু নিলোখেরির স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির প্রয়োজন। টাকার খরচের দিক থেকে দেখতে গেলে একে নিস্ফলা হ'লে চ'লবে না, নিলোখেরির জনসমাজ সেদিন একথা বুঝেছিল। বুঝেছিল যে নিজেদের মধ্যেও সংগঠনের সৃষ্টি ক'রতে হবে। নিলোখেরির সেদিনকার কাজ আর শুধু তারই কাজ নয়, বৃহত্তর দিগন্তের আরও বহু কাজ তাদের মাথা পেতে নিতে হবে। ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে পণ্ডিতজী আবার একবার এলেন। দেখলেন উপনগরীর বহিরঙ্গ জীবন, ইস্কুলের ক্লাশগুলিতে ছেলে মেয়ে উপচে পড়ছে, সকলেরই হাতে কাজ আর সর্বব্যাপী উৎপাদন কার্যাবলীর রূপ। এসব মিলে মনে হয় যেন উপনগরীর মুখখানি হাসিতে ভ'রে আছে। এক লহমায় এই আনন্দরাশি দেখেছিলেন সেদিন প্রধানমন্ত্রী। যাবার সময় বলে গেলেন, "ভারতবর্ষের আকাশ জুড়ে দশ হাজার নিলোখেরি ফুটে উঠুক আমি এই চাই।"

GOVT. TRAINING COLLEGE HOOGHLY Extension Services Dept.

## ॥ রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ॥

যেমন করেই হোক উপকারীর কথা ধরতে গেলে সে উদ্বাস্তদের জন্যই হোক না কেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো শিখতে হবে তাকে! বাইরের শক্তি বা ভিতরের সামর্থ্য কোন কিছুর দ্বারাই পুতু পুতু ক'রে ঢকে ঢকে দুধ গেলানো চলবে না। যা পেয়েছে তার উচিত মূল্য গুণে দেবার মত সামর্থ্য একে অর্জন ক'রতেই হবে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত দৈনন্দিন কাজগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার মতন নিজস্ব সামাজিক সংস্থা গঠন তাই অবশ্যই প্রয়োজনীয়। আমরা এই ক্ষুদ্র পরিবেশে সমাজ গঠনের যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রতী হ'য়েছিলাম, ঠিক সেইরকম এক সমাজের পূর্ণচিত্র ভারতবর্ষের নব প্রস্তাবিত সংবিধানে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপরে ভিত্তি ক'রে দাঁড়াবে এই জনসমাজ। মজদুর মঞ্জিলের যে অধিকার ত্রয়ের কথা আগেই বলেছি, যার উপরে নির্ভর ক'রে দাঁড়াবে এই মঞ্জিল, সংবিধানের মূলতন্ত্রে তার কথাই কি বলা হয়নি? সেই অনাগত লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম মহড়া আমি দিতে চেয়েছিলাম নিলোখেরিতে। তখনও নিলোখেরিতে একটা শাসনতন্ত্র কাজ চালাচ্ছিল। দরকার বোধ ক'রলাম এমন একটি জনসংস্থা তৈরি করার, যারা সরকারের সুযোগ্য অধিকারীরূপে সেখানকার কাজের ভার নেবে।

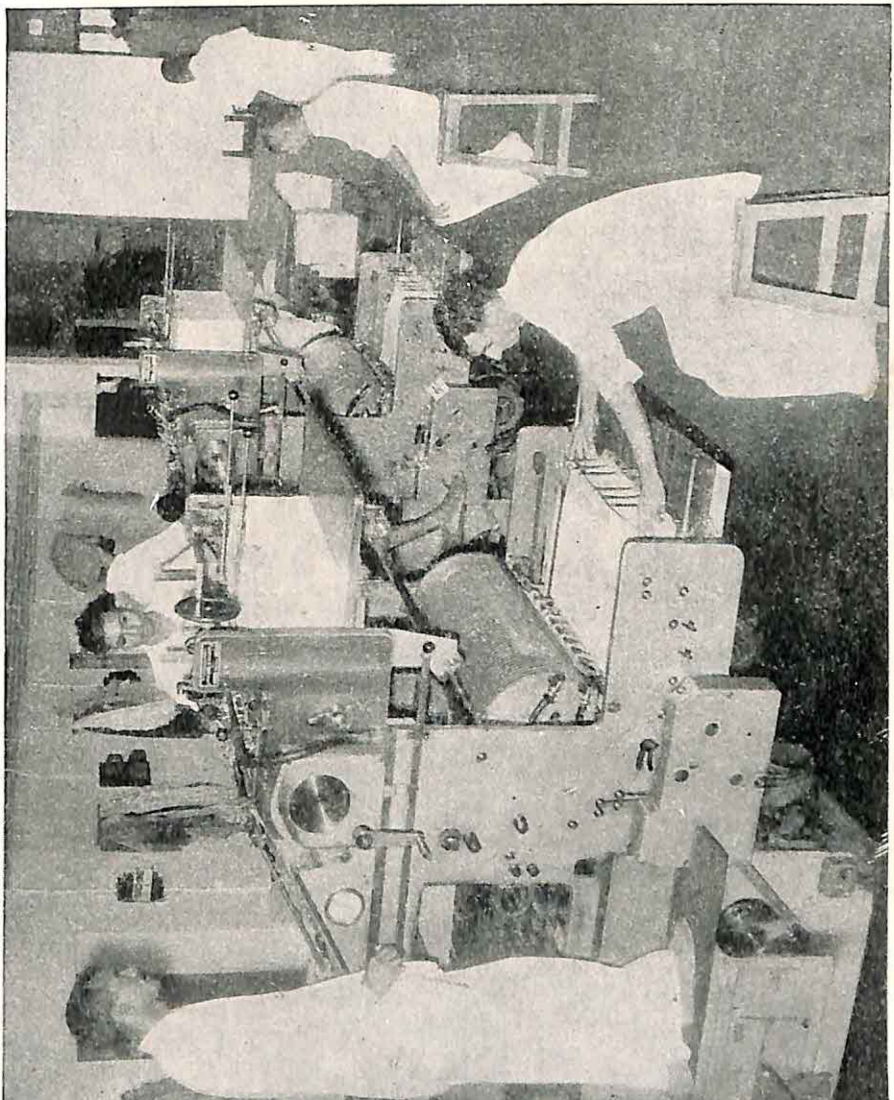
তৈরি হলো উপনগরীর উপভোগ্য চাহিদা মেটাবার জন্য একটি উপভোগ সমবায়; তার নাম দিয়েছিলাম কনজিউমার ক্লাব। উপনগরীর প্রায় প্রত্যেক পরিবারই এই ক্লাবের সদস্যভুক্ত হ'য়েছিলেন। প্রথমটা ইচ্ছা ছিল যে, কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীকে শহরের মধ্যে আমরা আসতে দেবো না। আমাদের উপনগরীর দৈনন্দিন চাহিদা কিন্তু তখন বেড়েই চ'লেছে। একটা কেন্দ্রীভূত সংস্থার তাই দরকার হ'লো যাতে ক'রে সমস্ত নগরীটার পূর্ণব্যাপী প্রয়োজনের সমাধান করা যায়। আর তা ক'রতে গিয়ে দেখলাম বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগের দরকার হ'লো, দরকার হ'লো বিশিষ্ট কার্যে পটু অধিকতর উপযুক্ত কর্মীবৃন্দের। কনজিউমার ক্লাবের উচ্চপদাধিকারী সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। ক্লাবের সম্বল তো মাত্র ক্ষণস্থায়ী কৃষিজাত দ্রব্য, তাতে পড়তা পড়েনা দেখা গেল। তাই যখন ব্যক্তিগত ব্যবসায়লিপ্ত স্বাধীন

বিক্রেতা মাথা তুলে দাঁড়ালো। সে আমাদের ক্লাবকে প্রায় কাঁপিয়ে দিল। মহাজন, ম্যানেজার আর শ্রমিক তার কিছুরই প্রয়োজন নেই। সে একাই সব কাজ করে।

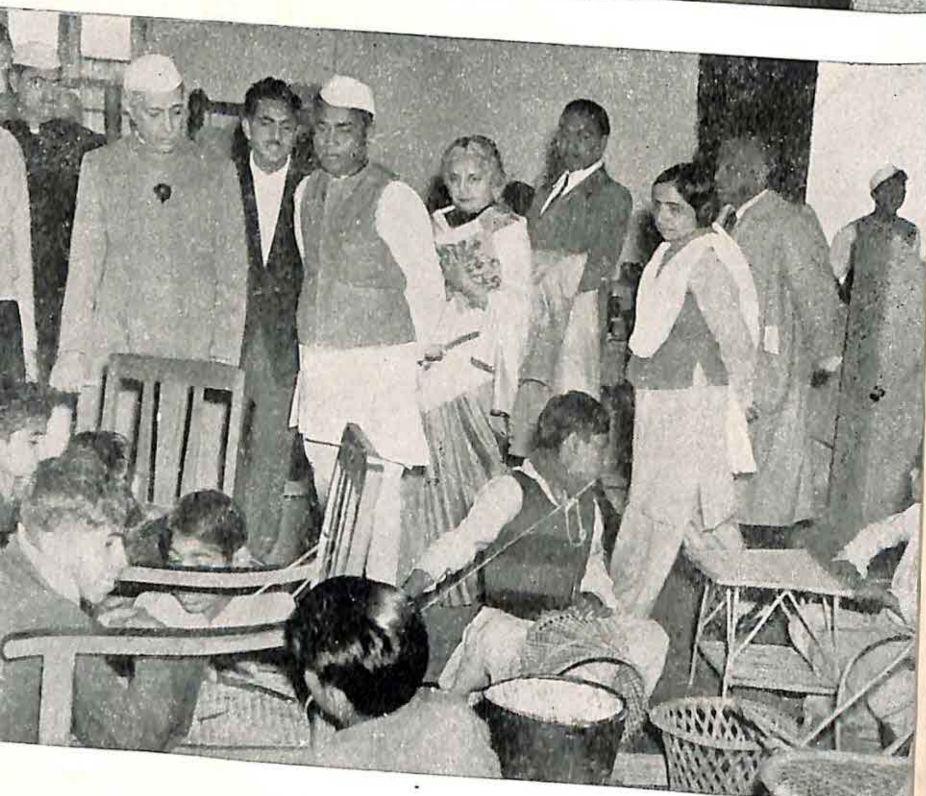
দরজা খুলে দিলাম আমরা অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে। তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ক'রতে দেওয়া হ'লো। কণ্ট্রোলের জিনিস বা যে সব জিনিসে ভেজাল মেশানো যেতে পারে, কনজিউমার ক্লাবের ভার প'ড়লো সেগুলো নিয়ে বাণিজ্য ক'রবার। প্রথম প্রথম কনজিউমার ক্লাবই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী বা দোকানদারের লাইসেন্স মঞ্জুরী ও দোকানঘর ভাড়া দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের শহরে সেদিন ব্যবসায়ীদের কি স্থবিধা, সবাই কাজ করে এখানে, সবাই রোজগার করে, সবাই কিনতে পারে। কিছুদিন পরে আমরা আবিষ্কার ক'রে স্তম্ভিত হলাম যে, কনজিউমার ক্লাবের দালালি আর অত্যাচার চরমে উঠেছে। সবটা ব্যবসা তাদের হাতে, তাই তারা যথেচ্ছা লাইসেন্স ফি ও অসম্ভব দোকান ভাড়া আদায় ক'রছেন। ব্যাপারটা চলতে পারতো না তাই কনজিউমার ক্লাবকে খর্ব করে শাসনতন্ত্র নিজের হাতে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও দোকান ভাড়ার কাজ তুলে নিলেন। এদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অবশ্য একাজের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত করা হয়েছিল।

কর্মীদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে উৎপাদন, বিক্রয় ও অন্যান্য কাজের ভার তুলে দিতেই হবে একথা স্মরণ করে আমরা সমবায় আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলাম। উদ্বাস্তুদের হাতে টাকা নেই, তাই মূলধনরূপী যন্ত্র ও কাঁচামাল কেনার জন্য অর্থ আগাম দেবার বন্দোবস্ত ক'রতে হ'লো। স্থযোগ দেওয়া হ'লো বহু কিস্তিতে ও যৎসামান্য স্থদে সে টাকা শোধ দেবার। আমাদের কর্মীদের অধিকাংশরই উৎপাদনের কাজে সেই প্রথম হাতে খড়ি। তাদের অধিকাংশই আগে দালালি ক'রতেন মাত্র, তাই বহুদিন যাবৎ সরকারকে বহুবিধ স্থযোগ-স্থবিধা দিয়ে তাদের সাহায্য ক'রতে হ'য়েছিল। দিতে হ'লো বৈজ্ঞানিক সাহায্য, কাঁচামাল কণ্ট্রোলে কেনার স্থবিধা, আর সবার শেষে যা তৈরি হ'লো তার বিক্রির ব্যবস্থা সরকারকেই ক'রে দিতে হ'লো। এসব কাজ চালাবার জন্য সরকারকে বহুবিধ বিজ্ঞানী কর্মীনিয়োগ ক'রতে হ'লো, হিসেব রক্ষক রাখতে হ'লো, শাসনতান্ত্রিক কাজ চালাবার জন্যও কর্মচারী এনে ফেলার দরকার বোঝা গেল। কিন্তু এত যে খরচা তার সবটা কখনোই ওঠে না। বিন্দু বিন্দু

করে কিছু হয়তো তোলা গেল, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপরে কিছু কর ধার্য করে। কুটীর শিল্প ও হস্তচালিত শিল্পকে ঘিরে সৃষ্টি হ'লো প্রথম সমবায়ের সূতাকাটা। তাঁতের কাজ, দর্জির কাজ, জুতো তৈরি ইত্যাদি কাজের জন্যও সমবায় সংস্থার সৃষ্টি হ'লো। এ সব কাজে যারা শ্রমিকরূপে যোগ দিলেন, আর কর্তা ব্যক্তির আসনে বসলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দক্ষতা বা পটুত্বে খুব বেশি তফাৎ রইলো না। সকলেই প্রায় একই দরের কাজে নামতে হ'লো আর তাঁদের আমদানি ও হ'তো প্রায় একই হারে। এঁদের মধ্যে যাঁদের ব্যক্তিত্ব কিছুটা প্রতিভাত হ'য়েছিল তাঁরাই চালকের কার্যভার গ্রহণ ক'রলেন। তাই প্রথম দিকে সমবায়গুলিতে দ্বন্দ্ব কলহ ছিল না বলেই চলে। দেখা গেল মজুরী দেওয়া হ'তো কে কতটা উৎপাদন করেছেন সেই অনুসারে, দৈনিক হারে নয়। এতেই বেশি কাজ পাওয়া যেত। যদিও যে সব কাজে দক্ষতা ও পটুত্বের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশি সে কাজের উৎপাদন বেড়ে গেল। সাচ্চা জিনিস পেতে এই আইনে কিন্তু অসুবিধা ছিল। এই সব বিভিন্ন কথা স্মরণ করে প্রতিটি শিল্পের জন্য বিভিন্ন রকমের মূল্য নির্ধারণের বন্দোবস্ত করার দরকার বোঝা গেল। তবু খুব বেশি একটা সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমাদের যা কাজ ছিল সেগুলিতে খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন ছিল না, আর সব ধরনের শ্রমিকরাই ছিলেন সমাজের একই স্তরের লোক। নিলোখেরিতে সেদিন ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ শিল্পের সংখ্যা বড় কম ছিল না। এদের তৎপর করার জন্য যন্ত্রকে আহ্বান করার প্রয়োজন হ'লো, আর যেমনি যন্ত্র এলো, তার সঙ্গে সঙ্গে এলো জটিলতা। জটিল যন্ত্র এলো, সেইজন্য প্রয়োজন হ'লো জটিল সংগঠনের, চাহিদা বাড়লো বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্বলিত কর্মী বৈজ্ঞানিকের। কর্মী তো বটেই, সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজের জন্যও এই ধরনের সুদক্ষ কর্মীর দরকার হ'লো। পৃথিবীর কোন দেশেই এই ধরনের দক্ষতা ও পটুত্ব জনসাধারণের সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমাদের তো অনুন্নত দেশ। আদিম-এর অর্থনীতি। এরকম পটুত্ব খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায় ; পাওয়া যায় না বললেই হয় আর পাওয়া গেলেও ধরে দিতে হয় তার উচ্চমূল্য। তাই দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর মধ্যে বড় দামের তফাৎ হ'য়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য যে দাম দিতে হয় সেও দেখায় বড্ড বেশি। ব্যবস্থাপনার উচ্চতম মঞ্চে যাঁরা আসীন তাঁদের আর নিম্নতম পর্যায়ের অদক্ষ







বৃত্তি শিক্ষণ কেন্দ্রে শ্রীনেহরু

শ্রমিকের মধ্যে তফাৎটা বড় ভয়ানক। যাঁরা এইসব উচ্চপদের প্রার্থী তাঁরা এসেছেন সমাজের সম্পূর্ণ একটা অন্যস্তর থেকে। তাঁদের সঙ্গে সাধারণ কর্মীর বোঝাপড়া হওয়া বড় মুস্কিল। অদক্ষ কর্মী, উৎপাদন কাজে যে দক্ষতা ও যন্ত্র নিয়োগের প্রয়োজন তা বুঝতে পারে না। দ্বিধাগ্রস্থ হয়, এই ধরনের কাজে কাঁধ পাততে চায় না। তাই তখন আমরা বাধ্য হয়ে স্থির ক'রলাম, যে এই ধরনের শিল্প সংস্থা গঠনের জন্য যে সমবায় হবে তার সদস্য হবেন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্মীরা।

এই সংস্থাগুলি হ'য়ে দাঁড়ালো অনেকটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মত। আমরাই এই ধরনের সংস্থার সৃষ্টি ক'রলাম। তবু তন্ন তন্ন ক'রে পন্থা খোঁজার সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ শিল্প গঠনের ঠিক উপায় আমরা স্থির করতে পারিনি। এই যে নতুন ব্যবস্থাপক শ্রেণীর যারা সমবায়ের সদস্যরূপে এগিয়ে এলো তারা দেখলাম অনেকটা পরগাছার মতন। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাদের নেই। যৌথ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে আত্মিক যোগাযোগ থাকে আর যে যোগাযোগ টুকু না থাকলে সমবায় হ'তে পারে না সে আত্মীয়তার পাশে সহকর্মীদের সঙ্গে বদ্ধ হ'তে তারা অক্ষম। কারণ সহকর্মীদের অধিকাংশরাই তো কো-অপারেটিভের বাইরে, এর বেতনভুক কর্মীমাত্র। ছোট্ট এই উপনগরীতে নাতিবৃহৎ ব্যবস্থাপক মণ্ডলীকে দিয়ে এবং তাদেরই স্বীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য নতুন রকমের সমবায় সংস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল না। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা থেকে স্ফুট ও আদর্শগত বিভিন্ন ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বে সেদিন এই সমবায় সংস্থাগুলি আকীর্ণ। এপথ ছেড়ে কিন্তু পালাবার পথ নেই। কারণ সরকারকে তখন আস্তে আস্তে স'রে দাঁড়াতেই হবে। স্বাধীন নিজস্ব শক্তিতে সমর্থ এমনি প্রতিষ্ঠানের হাতে তাকে তুলে দিতে হবে কর্মভার।

নগরে প্রত্যেকটি শিল্প-ব্যবসায়ের পক্ষে নিজ নিজ বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। আর সরকারের হাতে সম্পূর্ণ বিক্রির ভার তুলে দেওয়া একান্ত অনুচিত। তাতে দায়িত্ব জ্ঞান কমবে ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কিছু যদি বাড়ে তো বাড়বে উৎপাদনের কাজে শৈথিল্য। তাই মনে হ'লো একটা সম্মিলিত বিক্রয়-কেন্দ্রের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

উৎপাদন কাজে লিপ্ত বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে এ কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে পারতো কিন্তু তাও হবার নয়। ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সমবায়গুলি বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। সম্মিলিত বিক্রয় সমবায়টি হয়তো অধিক শক্তিশালী উৎপাদন সমবায়ের হাতের পুতুল হ'য়ে প'ড়বে। তাই একমাত্র পন্থারূপে তখন আমরা গ্রহণ ক'রলাম একটি নিরপেক্ষ বিক্রয় সমবায় গঠনের এক পরিকল্পনা। বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবসায়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের নিয়ে এই সমবায়ের সৃষ্টি হ'লো। কথা রইলো লাভ লোকসান যা হয় তা তাঁদেরই হবে।

এতেও চ'লবে না, কিছুদিন না যেতেই তা বোঝা গেল। একটি মাত্র বিক্রয় সমবায় নানা ধরনের উৎপাদনের কাজে হাত লাগাতে গিয়ে গোলমাল তো ক'রে ফেললোই কাজও কিছু ভাল ক'রে হ'তে পারলো না। বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সম্মিলিত বিক্রয় সমবায় হ'লে যা যা অসুবিধা হবে বলে মনে করা গিয়েছিল এই নতুন সমবায় সংস্থায় সেই সব অসুবিধার চরম প্রকাশ দেখা গেল। তখন আগল খুলে গেল। বিভিন্ন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'লো বাইরের যে কোন প্রতিষ্ঠান, সে সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক তাদের কাছ থেকে অর্ডার নেবার। যারা অর্ডার সংগ্রহ করে দেবে তারা অবশ্যই একটা কমিশন পাবে। যে বিক্রয় সমবায়টি হ'লো, সেটি অবশ্যই বেঁচে রইলো এদিক সেদিক—যে কোন উৎপাদন সংস্থার থেকে তাদের সুবিধামত জিনিস নিয়ে বাণিজ্য করে। কালে কালে এটি হ'য়ে দাঁড়ালো একটি এম্পোরিয়াম। তাদের সাজানো দোকান ঘরে তারা কমিশন নিয়ে জিনিস বেচতে লাগলো। দিল্লীতেও এরা একটা দোকান খুলেছিলো। বিভিন্ন উৎপাদন সমবায়গুলি নিজের নিজের পথ দেখে নিলো। বহু স্বপ্নের শিখরে পড়লো কুঠারাঘাত, এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ ক'রে দিলো যে সমাজবাদ অতো সহজ জিনিস নয়। সমাজের মঙ্গলবোধ ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে পারে না। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিটা যেন লকলক করে উঠলো তার সভ্যভব্য বাইরের আবর্তন ভেদ ক'রে। বুঝলাম যে উপনগরীর উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয় আর তাদের যদি বাইরের বাজারে চ'রে খেতে হয় তাহ'লে শুধু সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যবস্থা ক'রলে চ'লবে না, চাই মিশ্র অর্থনীতি। যে ব্যবস্থায় উৎপাদন শুধু যে সমবায় সংস্থার দ্বারা পরিচালিত

হবে তা নয় সরকারী ও ব্যক্তিগত মুনাফাদাররাও উৎপাদন কাজে লিপ্ত হ'তে পারবে। যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং উপনগরীর অর্থনীতির উপর যার প্রভাব খুব বেশি, নির্ধারিত হ'লো যে সেই সব কারখানাগুলি সরকারী তত্ত্বধানে থাকবে। ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপ, যন্ত্রচালিত ছুতোর কারখানাটি, ট্যানারি আর প্রিন্টিং প্রেস এই ব্যবস্থায় সরকারের হাতে এসে প'ড়লো। ছোট ছোট শিল্পগুলির এক একটি উপনগরীর বাসিন্দা বিজ্ঞানী কর্মীদের দিয়ে দেওয়া হলো। তাঁরা ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রে সেগুলি চালাবেন এই স্থির হ'লো। প্রত্যেক পরিবারকে ছয় একর ক'রে জমি দিয়ে দেওয়া হ'লো। এমনি করে উপনগরীর কৃষিক্ষেত্রটির ভাগাভাগি হ'য়ে গেল। জমির সংগে প্রত্যেক পরিবার পেলো বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, আর অল্প কিছু করে টাকা যাতে প্রথম বছরের চাষের কাজ তারা চালিয়ে নিতে পারেন। আর কো-অপারেটিভের ভাগে প'ড়লো সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলিতে খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন নেই, আর প্রয়োজন নেই খুব বেশি মাইনে দেবার সাধারণ শ্রমিকদের সংগে তফাৎ ক'রে। নিলোখেরি উপনগরীর সংমিশ্রিত অর্থনীতির এই হ'ল গোড়াপত্তন।

মিশ্র অর্থনীতির সামনে যদি গণতন্ত্রবাদকে তুলে ধ'রতে হয় তাহ'লে পঞ্চায়েত নামক সংস্থাটিকে জোরালো ক'রে তুলতেই হবে। সব বয়স্ক লোকের ভোটাধিকার বলে তাই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা হলো। সব শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক কাজের ভার প'ড়লো পঞ্চায়েতেরই উপর। আইন ও শৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, জনমঙ্গল, মায় সমাজের পঙ্গু সদস্যদের দেখাশুনা অবধি সব কাজই পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হ'লো। কলহ-বিবাদ মিটানোর ভারও পঞ্চায়েতেরই উপর। আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য সর্ববিধ কাজ পঞ্চায়েতের উপরে এসে পড়লো। এ পঞ্চায়েতটির পাঁচটি বিশেষ উপসমিতি গঠন করা হলো। আজকে সামগ্রিক বিকাশ আন্দোলনে পঞ্চায়েতীরাজের অঙ্গ হিসাবে যে সব কার্যকরী উপসমিতিগুলির কথা শোনা যাচ্ছে তাদের প্রথম প্রকাশ এই নিলোখেরি পঞ্চায়েতের পঞ্চ-উপসমিতির মাধ্যমেই ঘটেছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নিলোখেরিতে কোনদিনই খুব কঠিন ছিল না। কারণ এখানে বেকার তো কেউ ছিল না। কাজের অবসরের সময়টুকু কেটে

যেত ভবিষ্যত কর্মধারার আদর্শ বিচার ক'রে, আর মজতুর মঞ্জিলের তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। সমাজের সকলেরই আমোদ-প্রমোদে পূর্ণভাবে লিপ্ত হবার সুযোগ ছিল অখণ্ড।

একদিকে পঞ্চায়েত ও অন্যদিকে সমবায় সংস্থাগুলি, এরা ক্রমে ক্রমে বলশালী হ'তে লাগলো আর তার সংগে সংগে একটা নতুন সমস্যা দেখা গেল। সেটি হ'লো এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য ও যোগাযোগ রক্ষা করা। যখন সরকার নিজ হাতে উপনগরীর শাসন ভার পরিচালিত ক'রছিলেন তখন প্রশাসনিক সমস্যা কিছু মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু আজ দুটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাজ ক'রতে শুরু ক'রেছে। উপনগরীর জীবনস্রোত দুই ভিন্ন খণ্ডে এই দুই প্রতিষ্ঠানের হাতে। তাই এমনি সব সমস্যার সৃষ্টি হ'তে লাগলো যা আগে কখনো ভাবা যায়নি। আর শাসনযন্ত্রটা এই সব সমস্যার সামনে থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল বুঝি। এক প্রতিষ্ঠানে যাদের নেতাগিরিতে বাধা এলো অন্য প্রতিষ্ঠানে তারাই গিয়ে হালে পানি পেলো এমন উদাহরণও সেদিন অনেক দেখা গেছে। আগে যেখানে মনে মনে মিল ছিল আজ সেখানে দেখা দিল দ্বন্দ্বকলহ। সেদিন সবচেয়ে বড় সমস্যা তাই হ'লো কি করে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে একসূত্রে বাঁধা যায়। উপনগরী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এইটাই অবশ্য শেষ সমস্যা ছিল না। আরও এলো, আকাশ ভেঙ্গে পড়লো বিরাট বিরাট সমস্যার। আমাদের নতুন দ্বীপের সমাজবাদী আদর্শের রূপ তার আঘাতে জর্জরিত। এই অধ্যায়ে সে সমস্যারাশির হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেও এর পরের অধ্যায়ে এর থেকে পাঠকের মুক্তি নেই।

## ॥ পরিবর্তনের পথে সংকট ॥

এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে একবার চোখ মেলে দেখা যাক পৃথিবীর অন্য কোথায় কেমন ক'রে অর্থনৈতিক কাঠামো বদল ক'রে দিয়ে নতুনতর সমাজের স্থাপনা করা গিয়েছে। পশ্চিম মহাদেশে যে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল সেই দিয়ে এই আলোচনা শুরু করা যাক। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে স্থানীয় অর্থনীতিতে একটা ওলোটপালোট শুরু হ'য়ে যায়। হস্তচালিত শিল্প যন্ত্রচালিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারলো না। তাই বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার হ'য়ে প'ড়বে বলে ভয় হলো। আর এই কর্মহীনতার গতিরুদ্ধ ক'রতে হ'লে সেদিন শিল্পসংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার হ'তো। তাতে উৎপাদন বাড়তো, আর সেই সব দ্রব্যাদি কিনে নেবার ক্ষমতা স্থানীয় বাসিন্দার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এই তাগিদে জন্ম নিল উপনিবেশবাদ। শিল্প বিপ্লবের ফলে পশ্চিম মহাদেশে যে নতুন অর্থনীতির কাঠামো তৈরি হ'লো এমনিভাবে—সামন্তবাদী ও কুটীরশিল্পধর্মী পৌরাণিক কাঠামোর পরিবর্তে—তার ভার সামলেছিল এশিয়া ও আফ্রিকা দেশের নব আহরিত উপনিবেশগুলি। শিল্প বিপ্লবের পর ত্ব'শ বছর কেটে গেছে। পশ্চিম দেশগুলির মধ্যে একটিও কি বুকে হাত দিয়ে শপথ করতে পারবে যে পরস্বপোহারী শক্তি বিস্তারিত হ'লেও তাদের অর্থনীতিতে ভারসাম্য থাকবে আজও? বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধেই যে ত্বটি ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ ঘটে গেল তার কারণ তো এই ব্যবস্থার মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে ধনীদেশ আমেরিকাও নিজরাজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভার সাম্যময় অর্থনীতি সৃষ্টি ক'রেছে একথা বলতে পারবে না। সেখানেও থেকে থেকে অর্থনৈতিক সংকট হ'য়ে বেকার সংখ্যা হঠাৎ হু হু করে বেড়ে যায়—আর সচকিত করে তোলে অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দকে। চীন ও রাশিয়াও এই ত্বই বিপ্লবের পরেই তাদের তুই দেশে সর্ব-ব্যাপী ক্ষুধা লকলক ক'রে উঠেছিল। তার পেট ভরাতে গিয়ে কত মানুষের জীবনই না জলাঞ্জলি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই তোড়ে ভেসে

গেছে আরও কত আশা ও আদর্শবাদ। তাদের রক্তমাখা হাত আর দৃঢ় হস্তে ধরা ডাণ্ডা আর আগ্নেয় অস্ত্র সব সভ্যতার আবরণ ভেদ ক'রে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। ভারসাম্য, মনে মনে মিল, বিচার, ন্যায় ধর্ম এই দেশগুলিতে এই সব চিরস্থায়ী হ'য়েছে কি? একথা ঠিক যে রাশিয়া ও চীনদেশে বেকার সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেছে। জনশক্তি যে সবচেয়ে বড় শক্তি আর উৎপাদনের কাজে এর চরমতম প্রয়োগেই যে পরম আরাধ্য লাভ হবে তা তারা বুঝেছে। আর এর জন্য প্রশংসা পাবার যোগ্য। তবু এসব দেশে সকলের কর্মসংস্থান যে হ'য়েছে তার মূলে র'য়েছে আরও অনেকের বহু দুঃখভার ও বহু কষ্ট স্বীকার। বহুকে বলি দিতে হ'য়েছে সেখানে রাষ্ট্ররূপী পরম ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য। জাতির শক্তিকে অবরোধ ক'রে রেখে সৃষ্টি হ'য়েছে রাষ্ট্র নির্দেশিত নতুন অর্থ নৈতিক কাঠামো।

নিলোখেরিকে চারিদিকে মাটি দিয়ে ঘেরা একটি দ্বীপে পরিণত করার মোহ অনেকেরই ছিল। কিন্তু বেশ সময় থাকতেই বোঝা গিয়েছিল যে সমস্ত উপমহাদেশব্যাপী সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে এক টুকরো নিলোখেরি বাঁচতে পারে না। উপনগরী গ'ড়ে তোলার সময় আমাদের অনেক বিশেষ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয়। একবার এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের একটি দল তৈরি করে নিতে পারলে, ধীরে ধীরে তাদের যেখানে নতুন কাজ হবে সেখানে সরিয়ে নেওয়া যায়। অন্য সব দেশেই যেখানে রাতারাতি সংস্কৃতি ও অর্থনীতির যুগব্যাপী পরিবর্তন ঘটেছে সব জায়গাতেই এরূপই হ'য়েছিল। আমেরিকা ও রাশিয়া কেউই এই পরিবর্তনের হাত থেকে বাদ যায়নি। নিলোখেরিতে যে পরীক্ষা মূলক কাজ শুরু করা গিয়েছিল সেখানে ঠিক এই রকমটি হবার দরকার ছিল। এ তো দিনের মত পরিষ্কার। নিলোখেরির রচয়িতার কাছে এ সত্য অবিদিত ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রীর হুকুম মতো যথা সময় নিলোখেরি নামক আদর্শটির বহুল প্রচার ও তদনুযায়ী সংস্থা সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করাও হয়েছিল।

আমার প্রস্তাবের মূল্য নির্ধারণের জন্য তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫০ এর প্রথমভাগে পুনর্বাসন দপ্তর থেকে টাটা ইণ্ডাষ্ট্রির শ্রী, পি, এ, নারিয়েলওয়ালার নেতৃত্বাধীনে একটি কমিটি ক'রে দেওয়া হ'লো। আমি আর ডাঃ কেনিজ বার্গার

উভয়েই এই কমিটির সদস্য ছিলাম। ১৯৫০ এর শেষাশেষি এই কমিটির রিপোর্ট যখন হাতে এলো তখন দেখলাম যে আমাদের বুনিয়াদী তথ্যটি যেটি অর্থাৎ ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের কাজের ভিত্তিস্বরূপ রচিত হবে কৃষি ও শিল্পমুখী এক অর্থনৈতিক কাঠামো, সে সম্বন্ধে তাঁরা একমত। গ্রাম ও শহরের মধ্যে নিয়ত আদান-প্রদানের ভিত্তিতে পরস্পরের অর্থনীতি সুগঠিত হ'য়ে যাবে। উভয়ে মিলে একটা অবিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রবে। মন্ত্রণালয় এই রিপোর্ট পেয়েছিলো কিন্তু একবার নেড়ে চেড়েও দেখে নি। তখন সেই অবস্থায় আর কিছুই করার ছিল না। আমাদের বক্তব্যের ব্যাপক প্রচারের সময় তখনও আসেনি। কমিটি আমাদের মূল বক্তব্য মেনে নিয়েছে; কতলোক আমাদের পিঠ চাপড়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এতে ফল হ'লো উল্টো। অনেকের হিংসার আগুন ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠলো।

নিলোখেরিতে ইতিমধ্যে বাড়িগুলো তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল। যখন বাড়ি ছিল না, তাঁবুতে আমাদের বাস তখন নিলোখেরিকে দেখে মনে হ'তো যেন একটা জিপসী টাউন। ভিখারীরা আর বেদেরা বুঝি চিরকালের সমাজবাদী। কিন্তু বাড়ি যখন তৈরি হ'য়ে গেল তাতে কে ঢুকবে তাড়াতাড়ি আর কে পড়ে থাকবে বাইরে, যদি সব বাড়ি শেষ হ'য়ে যায় তখন কি হবে, এই নিয়ে লেগে গেল কাড়াকাড়ি। বহুদিন ধ'রে বহুকষ্টে লালিত আমাদের আদর্শ অতীত স্বভাবের আক্রমণে সেদিন যায় যায় অবস্থা। আমি সরে দাঁড়ালাম, হলপ ক'রে বললাম যে যতক্ষণ না তাঁবুবাসীদের শেষ ব্যক্তিটির একটিকেও একটি পাকা বাড়ি দিতে পারবো ততদিন আমি তাঁবুতে থাকবো। পঞ্চায়েত, কো-অপারেটিভ ও সরকারী ব্যবস্থাপকদের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নিয়ে একটি কমিটি ক'রে দেওয়া হ'লো। তারাই গৃহ-বণ্টনের ভার নিলো। এবিষয়ে আর খুব বেশি হৈ হৈ হয়নি। তবু আজকের আদর্শ ও তথ্যরাশির উপরে পুরাতন ইতিহাসের ভূত যে ভালভাবেই চেপে বসেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কোন। কবে কেমন ক'রে তাড়াবো এই ভূতটাকে তা আজও জানি না।

উপনগরীর সাংগঠনিক কাজ, রাস্তা তৈরি, ইলেকট্রিক লাইন বসানো, ড্রেনের বন্দোবস্ত এ সবই প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। তার মানেটা কি? গঠন কার্য পরিচালনার কাজে যাঁরা লিপ্ত আস্তে আস্তে সব কর্মীরাই এবার বেকার

হ'য়ে পড়বেন। সেই বহু প্রতীক্ষিত বিভীষিকাময় মুহূর্ত এসে পড়লো বুঝি। তাঁদের যদি অন্যত্র নিয়োগ করা যেত তাহ'লে নতুন উপনগরী গঠনের কাজে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয় হ'তো সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অতি দক্ষ ও পটুকর্মী এঁরা, কিন্তু এঁরা সকলেই কর্মী থেকে আরম্ভ ক'রে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য অবধি নিলোখেরিতে তাঁদের কাজের প্রথম হাতেখড়ি পেয়েছিলেন। নিলোখেরির শাসনব্যবস্থার আহ্বানে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন এসে। উদ্বাস্তু তাঁরা, অস্থায়ী কর্মচারী মাত্র। সরকারের কাছে স্থায়ী চাকরী চাওয়ার তাঁদের কোন অধিকার ছিল না। যাঁরা সেদিন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন এবং ইচ্ছা ক'রলেই সাহায্য ক'রতে পারতেন তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। নিলোখেরিকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের কোন আগ্রহই ছিল না। পীড়িত উপনগরীর বিকৃতি বিবর্তনের আর্তনাদ তাঁদের অট্টহাসির মাশুল জোগালো।

মেকানিক্যাল ও ছুতোরের কারখানাটি আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। তার অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়ালো। গঠনমূলক কাজ বন্ধ হওয়াতে সে আর অর্ডার পায় না। নিলোখেরিতে ছুতোরের দোকান গ'ড়ে ওঠা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। মিলিটারি বিতরণ কেন্দ্র থেকে ভাল ভাল সব মেশিন এনেছিলাম, সেগুলি তখনও ছোঁয়া হয়নি। ভারত সরকারের শিল্পদপ্তর থেকে অর্ডার পেতাম বইকি। কিন্তু আজ এই মন্ত্রণাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মীরা আমাদের জিনিস কিনতে রাজী হ'লেও তলার দিকে ইন্সপেক্টররা আমাদের খুশি ক'রতে নারাজ। গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ বিভাগ হ'লেও তাঁরা আরেকটি সরকারী বিভাগকে অর্ডার দিতে মোটেই উন্মুখ নন। আমাদের দ্রব্যাদি সরকারকে গছানো প্রায় অসম্ভব হ'য়ে প'ড়লো। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য একটার পর একটা ছুতো ক'রে আমাদের কাঠের কারখানার সব আবেদনই নামাঞ্জুর ক'রে দেওয়া হ'লো। উপনগরীর অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। আমাদের কেন্দ্রে বহু উচ্চ বেতনভুক কর্মী নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। দামী দামী মেসিন, বাড়িটার দামও কম নয়, সবই বেকার বসে রয়েছে। এত লোকের মাহিনাই বা আসবে কোথা থেকে।

কোনরকমে বাঁচবার জন্য আর গত্যন্তর না দেখে আমাকে অনেকখানি নরম হ'তে হ'লো। একজন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীকে ডেকে তার হাতে ফ্যাক্টরী তুলে দিলাম। তার কাছ থেকে কথা নিলাম যে কিছুদিনের মধ্যেই সে

শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কারখানাটিকে একটি সমবায়ে পর্যবসিত ক'রবে। যখন এ ব্যবস্থা ক'রলাম, হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে কথা সে দিল তার কোন মূল্য নেই। হয়তো তা বুঝেও ছিলাম, নিজের অজ্ঞাতে আমরা হয়তো আমাদের ঠকাবার জন্যে অর্ধেকটা প্রস্তুত হয়েছিলাম। কারখানাটি ব্যবসায়ীর হাতে যাবার পর থেকেই কিন্তু এর মাল সরকারী ইন্সপেক্টরদের আর অপছন্দ রইল না। সত্যিই তো ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা দক্ষ বটে। ছুতোর কারখানার পাশেই তৈরি বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানার লাইসেন্স আমরা আর একজন ব্যক্তিগত মালিকানা স্থত্রে কাজ ক'রতে ইচ্ছুক ভদ্রলোককে দিলাম। কণ্ট্রোল থেকে আমরা কাপড় আনিয়ে দেব এই লোভে নিলোখেরিতে এসে ব্যবসা ফাঁদতে ভদ্রলোক রাজী হ'য়েছিলো। এতে প্রায় আমাদের ১০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হ'লো। আজকে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান সম্বল হ'লো এই ছুতোর কারখানা, বস্ত্র ফ্যাক্টরী আর ছোট ছোট ব্যক্তিগত মালিকানাস্থত্রে পরিচালিত অনেক ব্যবসাকেন্দ্র যাদের জন্য আগে ভাগেই লাইসেন্স দেওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। যখন সমবায়ী ও সরকারী নেতৃত্বাধীনে বেশির ভাগ কাজ চ'লছিলো, তখন যত সব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর যাদের সমাধান ক'রতে গিয়ে এরা হাবুডুবু খেয়েছে, তার অনেক কিছুই এরা মিটিয়ে ফেললো।

ব্যক্তিগত মালিকানা দিনে দিনে শশীকলার মত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। গঠনমূলক কাজ আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে, তার শেষ হ'তে আর বাকী নেই, তার সংগে বাড়ছে কর্মহীনতা। অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম বেতনহার উপনগরীর কর্তৃপক্ষ বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই আইন আজ আর কেউ মানতে রাজী নয়, নতুন মালিকরাও না, এমনকি সমবায়ের কর্তৃপক্ষও নয়। যাঁরা আইন ক'রেছেন, আইন মানাবার আইনগত ক্ষমতা তাঁদের কিছু ছিল না—আর থাকলেও সে পথ তাঁরা বেছে নিতেন কিনা সন্দেহ আছে। এদিকে আবার নিলোখেরির নাম ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে, এখানে এলেই নাকি কাজ পাওয়া যায়, অন্য জায়গার চেয়ে মাইনেও নাকি বেশি পাওয়া যায়। কাজ কিছু না জানা থাকলেও নাকি চলে। তাই দলে দলে বেদেরা এসে উপনগরীর বাইরে তাঁবু খাটিয়ে বসে যেতে শুরু ক'রলো। অল্প কিছু বেতন পেলেই তারা কাজ ক'রতে রাজী। ঘর বাড়ি বা অন্যান্য খরচা তাদের কিছু নেই বললেই চলে,

যেটুকু আয় ক'রে সেটুকুই তাদের লাভ। বেদেদের মত চারপাশের গ্রাম থেকেও অনেক লোক এলো নিলোখেরিতে জীবিকা সন্ধানে। নিলোখেরির স্থায়ী বাসিন্দাদের চেয়ে সস্তায় নবাগন্তুকরা কাজ ক'রতে রাজী। নিলোখেরির নতুন মনিবরা তাই এদের দিকে হাত বাড়ালো। স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে বেকারের ভীড় বেড়ে যেতে লাগলো। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অর্থাৎ বাবুর বাবু যারা এইবার তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যখন নিলোখেরিতে সকলের কাজ ছিল তখন এরা প্রচুর চেষ্টা ক'রলেও আমাদের মধ্যে চিড় ধরাতে পারে নি। এদের গায়ে-পড়া দরদী কথায় কেউ ভোলেনি সেদিন, বরঞ্চ যথাযোগ্য স্থানে সর্বসাধারণ এদের দমিয়ে রেখেছিল। আজ তো তাদেরই দিন। চারিদিকে তখন একটা নেই নেই ভাব, কাজ নেই কোথাও, পাওয়াও যাবে না। তাদের নানারকম নিন্দার গুঞ্জনে উপনগরী ছেয়ে গেল। খবরের কাগজআলা আর পার্লামেণ্টের সদস্যদের কানেও কথা তুলতে তারা দ্বিধা ক'রলো না। এর আগে আমরা চুপ ক'রে থেকেছি, অথচ কাগজআলারা পার্লামেণ্টের সদস্যরা আমাদের কাজ দেখে আনন্দ প্রকাশ ক'রেছেন। বিবর্তনের কুজ্ঝটিকায় আমাদের নোঙর যখন ছিঁড়লো এঁরা সকলেই তখন বেঁকে বসলেন। নানারকম নিন্দার মধ্যে একটা কথা তখন নিলোখেরিতে ও অন্যত্র শোনা যাচ্ছিল কোটি কোটি টাকা একটা জলা জায়গায় নিমজ্জিত হ'য়ে যাচ্ছে। এই মৃত দেওয়ালের মধ্যেও তো আমাদের বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁরাও ছোবল মারলেন এই সুযোগে।

নিলোখেরির সব অধিবাসীরাই, তাদের দোকান ঘরের বা বাড়ির ভাড়া নিয়মিত দিয়ে যেতো, শিল্প সংস্থাগুলো তো দিতই। অন্যান্য উপনগরীতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের, তাদের নেতাদের ও উপনগরীর কর্তৃপক্ষদেরও এই এতে বিশেষ বিপদ হ'ল। যদি নিলোখেরির লোকেরা ভাড়া দিতে পারে তা হলে উপনগরীর লোকেরাই বা তা দেবে না কেন? শুরু হ'লো গোলমাল। সকলের চোখের সামনে অন্যান্য উপনগরীগুলি থেকে নানা প্রতিনিধি দল নিলোখেরিতে এসে হাজির হ'তে লাগলেন। মিটিং ক'রে সকলকে বোঝাতে শুরু করা হ'লো যে, ভাতা দেওয়া তাদের উচিত হ'চ্ছে না। এই পাগলা বাঙালি যাদুকরের কথায় ভুললে চলবে না। উদ্বাস্তুদের ভুলিয়ে নিজের কতকগুলি খেয়ালের দাম আদায় করাই তার মতলব। যারা

এই কথায় বেশ খানিকটা গ'ললো তাদের মধ্যে মূর্খ হ'লেও ভালো লোকও অনেকে ছিল। এদিকে কর্মসংস্থানের কোন বন্দোবস্তই ক'রতে পারছি না। দক্ষ ও অদক্ষ, বিশেষ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সবাই বসে পড়েছে, আর জনসংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। তাই ভাবলাম যে এখন কোনরকমে কিছু সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত মালিকানা সূত্রে পরিচালিত কারখানা এনে ফেলতে পারলে কিছু ফল হবে। নতুন হাওয়া লাগলে ভালই হবে তাতে। কিন্তু কি ক'রবো, ততদিনে আমাদের উপনগরী আর বাইরের বিভিন্ন মতলববাজ লোকদের মধ্যে গোপন মিতালী হ'য়ে গেছে। রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এখানে একটা রেল ওয়ার্কশপ ক'রবেন ব'লে। নিলোখেরির নতুন পাণ্ডারা তাঁদের ফিসফিস ক'রে বলে দিলো যে জায়গাটা জলা আর প্রত্যেক বছরই একটু একটু ক'রে ডুবছে। তাছাড়া এখানে যাদের দেখছেন তারা আজ না হ'লেও কাল কমিউনিস্ট হ'য়ে যাবে। কিছু ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করার জন্য শিল্পপতির তরফ থেকে লোক এসেছিলো তাদের আরও ভড়কে দেওয়া হ'য়েছে। তবু আমি দিনরাত চেষ্টা ক'রে চ'লেছি, যারা আমাকে বারবার আঘাত হেনেছে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রেম দিয়ে তাদের জয় ক'রবো। বারবার কর্তৃপক্ষকে বলেছি না-না-না, অন্যরকম ভাবে এদের কণ্ঠরোধ কর আমি তা চাই না।

উপনগরীর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মালিকরা তারপর শুরু ক'রলো সমবায়ে লিপ্ত কর্মীদের বোঝাতে। বললো, সমবায় ক'রে কিছু হবে না এটা তাদের বোঝা উচিত। তার চেয়ে মালিকবাবুদের দরজায় হাজির হওয়া ভাল হবে। ক্রমাগত কান ভাঙানিতে এরাও বেঁকে ব'সলো। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে গোলমাল শুরু হ'লো। যারা সেখানে কাজ দেখাশুনা ক'রতো তাদের মধ্যে কেউ সবচেয়ে কুঁড়ে লোকটাকেও কিছু ব'লতে গেলে সে ফোঁস ক'রে উঠতো। যারা এতদিন উপনগরীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলো, আমার প্রথম দিন থেকে এর কত সুখকে দুঃখকে নিবিড় করে ধরেছিলো, এর আত্মাকে ভালবেসেছিলো আজ তারা একে একে সমবায় ছেড়ে সরে যেতে লাগলো। আর তাদের জায়গায় যারা এসে নাম ভর্তি ক'রলো তাদের মধ্যে অনেকেই যারা জট পাকাচ্ছিল তাদেরই অন্যতম। নিলোখেরিতে যে পঞ্চায়েতটা এতদিন ধ'রে কাজ চলাচ্ছিল, কলহ দ্বন্দ্ব মেটানোয় জনসাধারণের মঙ্গল কর্ম আচরণে

তার জুড়ি বড় একটা দেখা যায়নি। পুলিস ছিল না নিলোখেরিতে, ছিল না আইন আদালত, সমাজের বিরুদ্ধে কেউ কোন অপরাধ ক'রলে পঞ্চায়েত তাকে গুরুদণ্ড দিত। অপরাধী স্বেচ্ছায় গলায় একটা বোর্ড-ঝুলিয়ে সমস্ত কলোনী ঘুরে আসতো। সেই বোর্ডের বক্তব্য এই হ'তো যে "আমি সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি, দুঃখিত হ'য়েছি, আর ব'লেছি এরকমটি আর হবে না।" এতে কেউ তাকে খারাপ মনে ক'রতো না, কিন্তু ভবিষ্যৎ অপরাধের পথ এর দ্বারা সুষ্ঠুরূপেই হ'তো নিশ্চিহ্ন।

এবার যিনি পঞ্চায়েতের কর্তা হলেন সরকারের অনেক টাকা ঋণ হিসাবে তিনি উদারাসাৎ ক'রে বসে আছেন। তিনি এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে দোকান থেকে জিনিস তুলে নিতে লাগলেন, অথচ দামটি দেবার নাম নেই। কেউ কিছু বলতে গেলেই চোখ রাঙিয়ে তাকে বলেন গলায় বোর্ড ঝুলিয়ে শহর ঘুরিয়ে দেবো। এদিকে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, প্রেতের নাচ শুরু হয়েছে চারিদিকে। নতুন নেতা ও তার নন্দীভৃঙ্গীরা এক শয়তানি চক্র গঠন ক'রে ফেললো। তাদের তখন অনেক কিছু চাই, তারা বুঝেছিল যে যতদিন তারা উচ্চাসনে উপবিষ্ট র'য়েছে, তাদের বাকী পাওনা আদায় করার জন্য সরকার তাদের স্পর্শও ক'রতে পারবে না। উপনগরীর লোকেরা স্পষ্টই বুঝেছিলো যে ভারত সরকার পূর্ব পাঞ্জাবের. গভর্ণমেণ্টের হাতে ( যদিও পাঞ্জাব সরকারের পূর্ণ অধিকার ছিল এই কলোনীর উপর ) এই উপনগরী পরিচালনার ভার তুলে না দিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের উপরেই সেই কাজের ভার ছেড়ে দেবেন। সাধারণ নাগরিক যারা তাদের তখন উভয় সঙ্কট। নিলোখেরি সমাজে তখন যা অবস্থা তার হাতে প্রাণ সঁপে দেওয়া অসম্ভব। আর অন্যদিকে পাঞ্জাব সরকারের দিকে ঘেঁষলেই বা কি লাভ! উপনগরীর জাগ্রত আদর্শ বা তাদের সুখ সুবিধার উপর এই সরকারের কোন দৃষ্টি নেই বলেই তারা জানতো। তাই নিজের অজ্ঞাতে এবং নিজে না চাইলেও কলোনীর প্রায় সমস্ত নাগরিকরাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে গুঞ্জরণ চ'লেছিল ছুতাছাতা ক'রে তাতে তারা আহুতি জোগাতে লাগলো। ইতিমধ্যে কোরিয়ার লড়াই থেমে গেল, কেনাকাটির বাজারে প'ড়লো মন্দা। নিলোখেরিতে বেসরকারী মহলেই এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সর্বপ্রথম কাপড়ের ফ্যাক্টরীটা বন্ধ হ'য়ে গেল, মনে হলো

অন্যগুলোও বন্ধ হ'য়ে যাবে শীঘ্রই। শুরু হ'লো গোলমাল চারিদিকে। বড় গোলমাল—আরও গোলমাল।

জীবনের চাঁদনীচক হ'য়ে দাঁড়ালো এই নিলোখেরি। একদিন যে ভীষণ তেজ নিয়ে এখানে বহু আদর্শের সৃষ্টি হ'য়েছিল এই উপনগরী, তারই জন্য বোধ হয় জলুনীও এত ভীষণ। জলা জায়গায় একদিন এই উপনগরী ভেসে উঠেছিল। সেদিন আগন্তুক উদ্বাস্তু নাগরিকের নিলোখেরি প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করেছে, কে তুমি? যতক্ষণ না আগন্তুক কাজ করে নিজের জায়গা ক'রে নিয়েছে ততক্ষণ সেই প্রশ্ন বিরত হয় নি। এবার সে একই প্রশ্ন অন্য সুরে গাওয়া হ'লো। গোলমালের পাণ্ডা যারা, শান্তিপূর্ণ আদর্শবাদী যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তখনও কাজ ক'রে চলেছে, এ প্রশ্ন ক'রে তারা সেদিন তাদের উল্টো পথ দেখিয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী আবার নিলোখেরিতে এলেন বারে বারে তিনবার। আমার সঙ্গে তাঁর আমাদের কাজের প্রথম দিন থেকেই নিয়ত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। আমাদের সমস্যার কথা তিনি জানতেন, তবু তিনি যখন এলেন সমস্ত উপনগরী এক হ'য়ে গেল, মিলিত হ'য়ে জানালো তাঁকে অভিনন্দন। পিতৃস্বরূপ তিনি, এই উপনগরীর জনক। যাওয়ার আগে তিনি আবার সেই ধ্বনি তুললেন "এই নিলোখেরিকে আমি চিনি তার জন্ম থেকে। এখানকার লোকেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা ক'রেছেন তা আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। নিলোখেরির বাণী বলেছে যে, কাজই হ'লো সব মানুষের স্বর্গীয় ধর্ম। সত্যিকারের সামাজিক সংগঠন জীবনের আদর্শকে সত্য করার ও প্রাণ বাঁচানোর পথ দেখাবে। এই বাণী মূর্ত করার জন্য একটা নয়, আমি চাই আরো নয় হাজার নয়শ নিরানব্বইটি নিলোখেরি।"

NING COLLEGE
OOGHLY
ion Services Dept.

## ॥ রক্ত, ঘাম, আর অশ্রু পথ দেখালো ॥

সমাজবাদের দ্বীপ হ'তে না পারলেও নিলোখেরির সমাজবাদী আদর্শ একেবারেই পূর্ণ হয়নি একথা ভাববার কোন কারণ নেই। ১৯৬১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় এই উপনগরীর লোক সংখ্যা সেদিন ৮ হাজার। পরিশিষ্টটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, যত টাকা এখানে ঢালা হ'য়েছে তার অধিকাংশই নিলোখেরি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। কাজ, কাজ আর কাজ চলেছে চারিদিকে। এখনও এখানে লোকে লোকে যে ভ্রাতৃভাব বিরাজমান দেশে বিদেশে বহু জায়গাতেই তা নেই। দেশে বিদেশের লোক সেকথা শুনলে আজও ঈর্ষান্বিত হবেন। দশ বছর হ'লো ভারতভূমির মুক্তপ্রান্তরে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল এই উপনগরী। আজও আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে দেখতে গেলে এ কলোনীতে সমস্যা বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেই, জাতি বা রাজনৈতিক আদর্শগত বিভেদ নেই, নেই কোন লোকের টাকার পরিমাণে তাকে সেলাম করার ঝোঁক। বরঞ্চ এ সমাজের যে কোন সদস্যকে সবাই শ্রদ্ধা জানায় তখনই, যখন তার হৃদয়ের গুণাবলীর পরিচয় পায়।

কত কি ঘটে গেল চারিদিকে, তবু প্রথম দিন থেকে এই উপনগরীতে যে কয়েকটি বিশেষ গুণাদর্শের সৃষ্টি করার চেষ্টা হ'য়েছিল তা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। কিন্তু যেটা ভাবা হ'য়েছিল বা চাওয়া হ'য়েছিল তা হ'লো না। সমাজবাদের দ্বীপ নিলোখেরি এই নিলোখেরি নয়। আজ এখানে বেশির ভাগ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই হ'লো হয় সরকারী নয়তো বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানাসূত্রে স্থাপিত। আমাদের প্রাচীন ভিত্তির উপর সমবায় আন্দোলনের সবেমাত্র শুরু, তবু সর্বদেশে ও সর্বকালের জন্য নিলোখেরির বোধ হয় বক্তব্য আছে। বহু সহস্র লোক পাঁচ বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এখানে তাদের নিজ গৃহ স্থাপনের জন্য। সেই কাহিনী থেকে বেছে অন্যকে দেওয়ার মত উপদেশ খুঁজে বার করা বড় সহজ নয়। তবু সে চেষ্টা এই বইতে করেছি। ভবিষ্যতে হয়তো এর দ্বারা কিছু সুবিধে হ'তে পারে।

আজ দিনটা কালকেরই পরিণতি, কাল উপচে প'ড়ে ঘ'টেছে আজ। তেমনি

ভাবেই আবার আসবে আগামীকাল। জীবন ব'য়ে চলে। অতীতের ভুলভ্রান্তি যখন সংশোধন ক'রতে চাই তখন কখনও কখনও মনে হয় অতীতকে পদদলিত করে আবার নতুন ক'রে শুরু ক'রবো। ভবিষ্যতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দেব না তার। জীবনের স্থায়িত্ব আনতে হ'লে এরকম ভাবে কিছু করা যায় না। গত কালকের অভিজ্ঞতা থেকে আগামী কালের অনেক কিছু শিখবার আছে। অতীতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ক'রে নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবার কাজ শুরু করার মধ্যে নতুনত্ব হয়তো আছে, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ সেটা নয়। নতুন জীবনের রূপ সে যত বিপ্লবমণ্ডিতই হোক না কেন পুরাতন দিনের দর্শনের সঙ্গে তার একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকা দরকার। ভারতবর্ষ পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা হবে তার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক সর্বমুখী বিকাশ ঘটতে পারে একান্তই আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর ভিত্তি ক'রে। এই ভারতবর্ষের জমি, আসমান, আর সত্বা থেকে বেরিয়ে আসবে সেই নতুন রূপ, আহরণ ক'রবে তার প্রাণ। অন্য দেশ থেকে ধার করা বিদ্যা দিয়ে তা চলবে না। স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়া জীবনগতি থেকে প্রাণ বেরোতে পারে না।

সরকারী কর্মচারীদের উপর যেমন অত্যধিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকার কোন মানে হয় না, তেমনি তাদের দেখলেই মুখ সরিয়ে নিতে হবে এরও কোন মানে নেই। তারাও ভারতবর্ষের নাগরিক। আমাদেরই পরিবারের অংশ ভাইবোন, ছেলেমেয়ে কেউবা। এ দেশের যা কিছু ভাল মন্দ তা তাদের মধ্যেও সমভাবে প্রভাবিত। বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদেরই বেছে নিয়ে সরকারী শাসন যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে। তর্কের কথায় ব'লতে গেলেও এর চেয়ে মহত্তম সত্বাবিশিষ্ট শাসনযন্ত্র এখুনি তৈরি করা সম্ভব নয়। শাসনযন্ত্রটি যদি আশানুরূপ কাজ না করে তবে এর সামনে একটা নতুন আদর্শ, কাজ করার একটা অমিতস্পৃহা এনে দিতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এমনি ভাবে গ'ড়তে হবে যাতে এই নতুন আদর্শকে চিরকালের মত তারা আঁকড়ে ধরতে পারে। কিছুদিন অন্তর অন্তর ভোটযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে জনসাধারণের যে প্রতিনিধিরা এসে শাসনসংস্থা অধিকার ক'রে বসে তারাই সরকারী যন্ত্রটাকে দিতে পারে এই নতুন ভরসা। দেশের বিভিন্ন কামনা ও আশঙ্কার দিকে এরাই ফেরাবে তার মুখ, প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে।

অবৈতনিক কাজ ক'রলে শ্রদ্ধা কুড়ানো যায় বটে কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। অনেকেই আছে যারা শুধু প্রেমের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত, কিন্তু সে পাগলের দল ক্রমশঃই হালকা হ'য়ে আসছে। যে কোন সমসমাজে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে কাজ ক'রতে পারবে এমন লোক থাকা অসম্ভব। বেতন না দিলে তার জৈব জীবন যাপনের জন্য তাকে অন্য কোন জায়গা থেকে অর্থ নিতেই হ'বে। সমসমাজে এরকম অন্য তহবিল জমা করে তোলা, কোন সদুপায়ে তা একেবারেই অসম্ভব। অবৈতনিক কাজ যারা করে, সমাজবাদী সমাজে তারা অন্যের চেয়ে অনেক বেশি নেয়। যারা কাজ করবে তাদের পূর্ণ বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত সে সমাজে থাকা উচিত। সমস্ত সক্রিয়তা ও সতেজ সমাজ জীবনে অবৈতনিক কর্মীদের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা উচিত। তারাই আনে উদ্বৃত্ত কর্মশক্তির ধারা। বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাই সব সমাজেই থাকা উচিত, এরা বহুবিধ কাজ করতে পারে। এর সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের উদ্বৃত্ত সময় শ্রমদান করবে। তা না হ'লে মানুষের মধ্যে যে শয়তানটা আছে ফাঁকা সময় পেলে সে সিং চাড়া দিয়ে উঠবে। যারা বলে যে তাদের পুরোটা সময় অবৈতনিক কর্মী হিসাবে দিতে প্রস্তুত, তারা হয় মুনাফাখোরি সমাজের শেষ চিহ্ন, নয়তো ঠগ। কথায় বলে মধ্যরাত্রের পর প্রেম ও ধর্মকেও ঘুমাতে হবে, অবৈতনিক কর্মীদেরও তো পেট আছে সেটা চলবে কি ক'রে? একথাটা মনে না রাখতে পারলে বিপদ হয়।

শাসনযন্ত্র শাসন কাজ চালাবে, যে যন্ত্রটা সে কাজ ক'রতে বীতরাগ, তার ভরণপোষণ করা সমাজের পক্ষে বিলাসমাত্র। বুদ্ধিমান শাসক যিনি তিনি হয়তো মুহুর্মুহু গদা চালাতে নারাজ কিন্তু গদা যন্ত্রটা যে তাঁর কাছে আছে সেটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। সাপ যদি ছোবল মারতে না চায় না মারুক, কিন্তু তাই বলে যদি সে ফোঁসও ক'রবো না এই ব্রত ধরে, তা হলে পদাঘাতে মৃত্যু হওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই। তেমনি মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে তার মধ্যে কিছু দোষ থাকবেই। সুযোগ্য শাসক যে তার কাজ হলো এই দুষ্ট প্রবৃত্তিটাকে দমন করে রাখা। তার জন্য অবশ্য বেশি জোর খাটানো, কি কি হাতিয়ার আছে সব সময় তা জাহির ক'রে বেড়ানো উচিত নয়। সাউথসী আইল্যাণ্ডে যে চিরবসন্তের লীলা

চলতো বাষ্প যুগের সঙ্গে সঙ্গে তার ইতি ঘটেছে। আজ স্পুটনিকের যুগে হাজির হয়েছি আমরা। এখানে চারিদিকের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধু একখণ্ড জমির উপরে প্রাচুর্যের সৃষ্টি করা যায় না। সমাজবাদী দ্বীপ গড়া তো কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। স্বাধীনভাবে যদি কোন অর্থনীতিকে গ'ড়ে উঠতে হয় তা হলে তার চোখে ঠুলি পরালে চলবেনা ; সকলের থেকে আলাদা করে নিয়ে সমাজবাদের সৃষ্টি হয় না। সরকারী, বেসরকারী ও সমবায়ী সংস্থাগুলির মিলিত শক্তিতেই সমাজবাদের গোড়াপত্তন। আর এই মিলন ঘটাবার পরম দায়িত্ব হ'লো শাসন যন্ত্রটার। সমবায়ী-ই বলুন, বেসরকারী, সরকারী যাই বলুন অর্থনৈতিক সংস্থা চালাতে হলে কিছুদিনের মধ্যে তার কোন কোন জায়গায় ঘুণ ধ'রবে। সরকারী সংস্থার আয়োজন বেশি হ'লে তাকে কোন না কোন লোকের কণ্ঠরোধ ক'রে বাড়তে হবে। বেসরকারী সংস্থা চালকেরা আমাদের প্রার্থিত বহু আদর্শবাদকে লুণ্ঠন না ক'রে বাঁচতে পারবে না। আর সমবায়ীরা কিছুদিন যেতে না যেতেই হ'য়ে প'ড়বেন গতানুগতিক, প্রাণহীন ফ্যাকাসে। তাই দেখছি যে একটি মাত্র পন্থা অবলম্বন করলেই যে সমাজের সর্বরকম মঙ্গল হবে বা সেই পন্থাটিরই জয় হবে এমনও কোন মানে সেই। সমাজবাদের পথ মিশ্র অর্থনীতির পথ। প্রতিযোগিতা থেকে প্রাণ আহরণ ক'রবে সে ; আর যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাদের সঙ্গে মিলে মিশে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে তালে তাল মিলিয়ে বাঁচবে যেমনি করে বাঁচে যৌথ পরিবারের সকলে।

সমবায়ে সাফল্যলাভ করতে হলে যারা একই সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে সমবায়ের সদস্য তাদেরই ক'রতে হবে। অনুন্নত দেশে এর ফলে ছোটখাটো শিল্পকলা ও ব্যবসার কাজে এর একমাত্র প্রয়োগ হ'তে পারে। এসব কাজে প্রাচুর্য কখনও আসবে না। আজ যদি আমাদের এগোতে হয় তাহলে উন্নততর যান্ত্রিক কর্মশক্তি ও জটিলতর সংগঠনের প্রয়োজন হবে। অনুন্নত দেশে বিশেষ করে এসব শিল্পের ব্যবস্থাপক ও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে। এরকম পরিস্থিতি থেকে বের হবার পথ মাত্র কিন্তু দুটো। যারা বড় শিল্পের মালিক হয় তাদের একত্র করে স্থাপনা করতে হবে বড় দরের ব্যবসায়ীদের সংঘ (Kartel) যেমনটি আছে পৃথিবীর বহু জায়গায়, আর তা না হ'লে

ক্ষুদ্র-শিল্পের মালিকদের একত্র ক'রে সমবায় সংস্থা গড়তে হয়। এরা বড় ব্যবসায়ী সংঘের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারবে সে শক্তি তাদের থাকবে। যান্ত্রিক শিল্পমুখী সভ্যতা গঠন ক'রতে হ'লে আজ একথা মেনে নিতেই হ'বে যে অন্ততঃ বিবর্তনের প্রথম দিনগুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের সমবায়ী গ'ড়ে তুলতে হ'বে। শ্রমিকদের নিয়ে কো-অপারেটিভ করার সময় এখনও আসেনি।

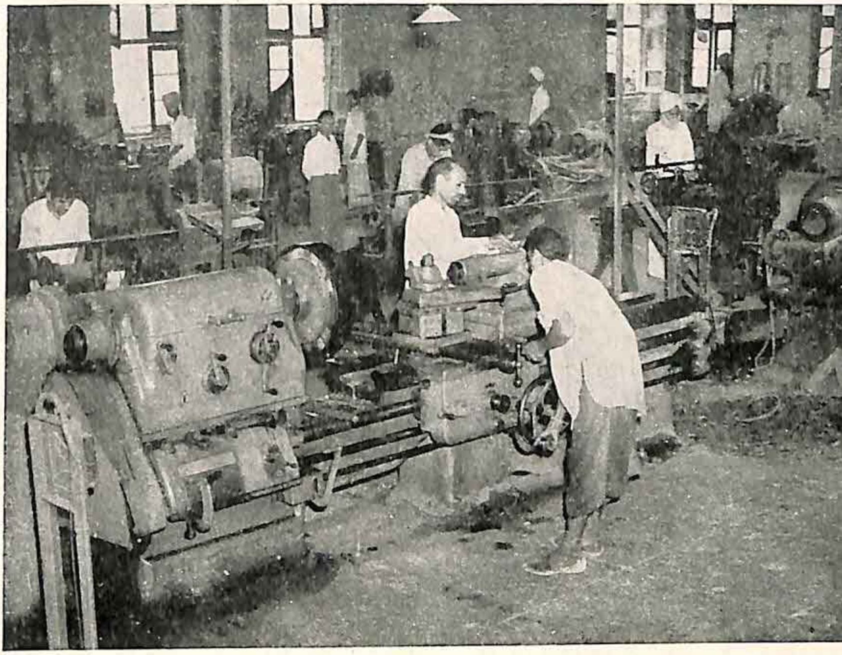
ভারতবর্ষ পল্লী প্রধান দেশ। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখা গেছে যে শতকরা ৮২'৭ জন লোক গ্রামেই থাকেন, বাকী ১৭'৩ জন থাকেন শহরে। ১৯৬১ সালের অবস্থাটা হ'লো ৮২'৩ জন গ্রামে আর ১৭'৭ জন হ'লো শহরে। এই ১০ বছরে গ্রাম থেকে হু হু ক'রে লোক এসেছে নগর ও উপনগরীগুলিতে—প্রতিটি শহরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু শহরে গ্রামের লোক ভাগাভাগিতে তফাৎ হ'য়েছে মাত্র ০'৪। তাহ'লেই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে—যাই হোক ভারতবর্ষ গ্রামীন দেশই থাকবে। আমাদের স্থায়ী সংস্কৃতি হবে কৃষি ও শিল্পের সংস্কৃতি। তার মানে হ'লো এই যে শহরের উপরে গ্রামীন সভ্যতার কিছু ছোঁয়াচ লাগুক, আর গ্রামে আসুক শহর জীবনের কিছুটা উদ্দীপনা। শহরকে আর গ্রামের উপরে পরগাছার মত থাকতে দিলে চ'লবে না। শহর ও গ্রামে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকাও উচিত নয়। দুয়ে মিলে এগোবে, দেবে আর নেবে, নতুন অর্থনৈতিক সভ্যতা এমনিভাবে গ'ড়ে উঠুক। এই কৃষি ও শিল্পমুখী সংস্কৃতিতেও আমাদের সমাজবাদী সভ্যতায় যারা বাস ক'রবে তাদের অর্থনৈতিক মানের খুব বেশি তফাৎ থাকলে চলবে না। তেমনি শহরে ও গ্রামেও খুব বেশি তফাৎ না থাকুক এই কাম্য। সামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক সাম্য আনয়নই গণতন্ত্রের লক্ষ্য, তাই যদি কেউ হঠাৎ প্রচুর সম্পদ বা মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটবে। সে পথ তাই বন্ধ ক'রতে হ'বে।

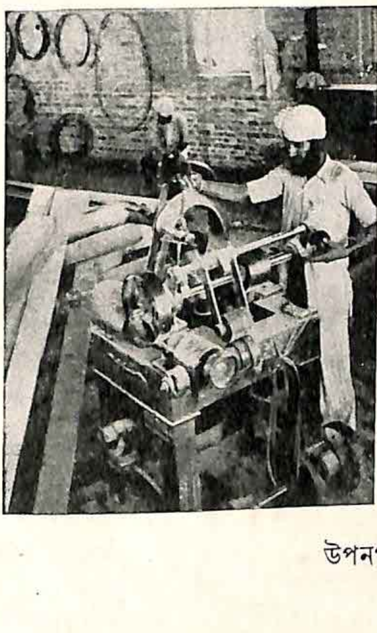
এই সমাজবাদী সংগঠনের কথা বলতে গিয়ে সামূহিক বিকাশের কথা মনে পড়ে। সমাজের সর্বস্তরের লোকের সমবিকাশ। সমাজে যারা দুর্বল উন্নয়নের সময় তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হ'য়ে অবিচ্ছেদ্যরূপে প্রকাশ পাবে সামূহিক বিকাশ, পঞ্চায়েতী রাজ ও সহকারী সমাজ—আমাদের ত্রয়ী আদর্শ। এ ত্রয়ী, মূর্ত হবে কিনা তা

অবশ্য নির্ভর ক'রছে সাধারণ লোকের সামগ্রিক আন্দোলনের উপর। শিক্ষারই হাতে রয়েছে আসল চাবিকাঠিটি। শিক্ষার দ্বারা মুক্ত হবে আবাল বৃদ্ধ, সর্ব বিষয়ের নেতাদের বদ্ধ দরজা যাতে ক'রে তারা মঞ্জিলের দিকে এগোতে পারে। গণতন্ত্র যেন একটা কচিগাছ—আপন জৈবিক কানুনেই হবে এর বিকাশ। যে ভাল মালী সে নিশ্চয়ই এর বাড়ের গতি দ্রুততর ক'রতে পারে কিন্তু রাতারাতি কিছু গজিয়ে তুলতে পারে না। গণতন্ত্র সক্রিয় নেতৃত্ব পেলে এ চারাটা হয়তো তাড়াতাড়ি সজীব হ'য়ে উঠবে কিন্তু রাতারাতি কিছু ক'রতে হলে বিপদেরই ভয় বেশি। মনুষ্য সমাজের সুপরিকল্পিত বাগিচা হ'লো গণতন্ত্র। জঙ্গলের রূপের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। পরিকল্পনা আর গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আর এই গণতন্ত্র ও কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্টের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

অনুন্নত দেশে বিবর্তনের প্রথম কটা দিনে সরকার সামূহিক বিকাশের কাজে বেশ কিছু সাড়া দেবেন একথা সত্যি। কিন্তু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজ যেন কখনই শাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল না হ'য়ে পড়ে। সেটা সামলানো সবার আগে প্রয়োজন। সমাজের উন্নয়ন স্রোতকে যদি চিরস্থায়ী করতে হয় তাহলে সমাজকে আগে উন্নত ক'রতে হবে, আর সেকাজ সমাজ স্বীয় শক্তির দ্বারা ও নিজ কল্যাণ পরিকল্পনায় নিজেই ক'রবে। সমাজ যতটুকু সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে উন্নয়নের ঠিক ততটুকুই ক্ষতি হবে। হয়তো সরকার অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে পারে এবং জোর করে উন্নয়ন ঘটালে অল্প দিনের জন্য হয়তো অপূর্ব অনেক কিছু ঘটিয়েও তোলা যায়, কিন্তু তাতে মানুষের স্বাধীন চিত্ত ঠাণ্ডা ঘরে কোণঠাসা হ'য়ে যায়। মুক্ত বায়ুতে এনে ফেললেও শ্বাস নিতে অসুবিধা হ'তে থাকে। আর এমনি ভাবে বহু অনিশ্চিত পীড়নে বিকলাঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে তার শক্তি। সমাজ একটা ভেড়ার পাল নয়—সর্বলোকের স্বাধীন বুদ্ধি ও শক্তির সংগঠন। সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে তার যোগফলই হ'ল সমাজের স্বাধীনতা। কোন সদস্যের স্বাধীন আচরণের উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করলে ঠিক সেই অনুপাতে সমাজের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে। ভগবান ও শয়তান দুটো আলাদা বস্তু নয়। শক্তির উৎস এ দুই ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ভগবানের ছায়া পড়েছে তাঁর সৃষ্ট মানুষে।

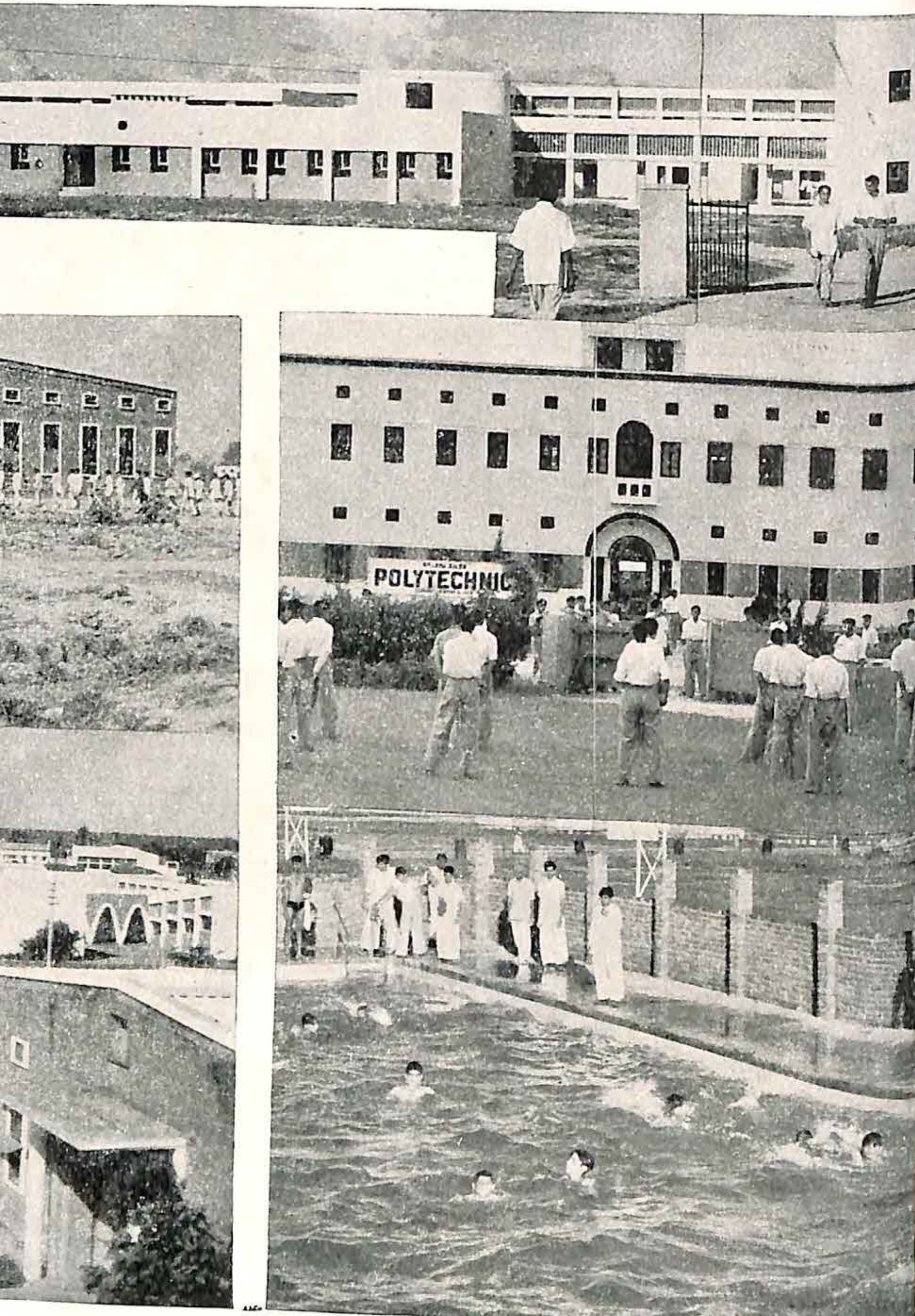
তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পরমার্থিক শক্তি আছে। পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পরম উন্নয়নের চরম শক্তি তাই মানুষেরই মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় মানুষের উন্নয়নের গতি বুঝি বড় শ্লথ, কিন্তু একবার চ'লতে থাকলে সে থামে না। চলার মাঝেই শক্তি সংগ্রহ করে সে। জ্যামিতিক গতিতে এগিয়ে চলে—আজাদী পেলে ফুটে ওঠে। গণতন্ত্র যেন একটা খোলামাঠ। কু ও সু দুজনেরই লীলা চলেছে সেখানে। যদি একটিকে সরিয়ে দিতে চান, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটিরও বিলুপ্তি ঘটবে। কু ও সু'র অবিরাম লড়াইএর যুদ্ধক্ষেত্র এই জীবন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রও বটে।







উপনগরীতে শিল্প গড়ে উঠছে




নিলোখেরি পলিটেক্নিক

## ॥ টুকরো টুকরো ঘটনা—অতীত দিনের কাহিনী ॥

নিলোখেরির কাহিনীতো প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, কিন্তু নিলোখেরি একটা কাহিনী মাত্র নয়। একটা কাহিনী মাত্র রচিত হবে—তারজন্য এর জন্ম হয়নি। স্বাধীনতার নবপরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জীবনে এক নতুন পরীক্ষার পালার সূচনা এই নিলোখেরি। ১৯৪৭ সালে পেশা শিক্ষণকেন্দ্রের দরজায় একটা সাইনবোর্ড ঝোলান ছিল। 'নয়া পথ, নয়া সড়ক যাচ্ছে নতুন ভারতবর্ষের দিকে'—এই কথা কয়টি তাতে লেখা ছিল। বৃত্তি শিক্ষণকেন্দ্র পথ দেখালো, তাইতো সৃষ্টি হলো কর্মকেন্দ্রগুলির ; কর্মকেন্দ্রগুলি পথ দেখালো, তাইতো সৃষ্টি হ'লো নিলোখেরি উপনগরীর। আর পরীক্ষাটি যদি খাঁটি হ'য়ে থাকে তাহলে এর বিস্তার অক্ষুণ্ণ হ'তে হবে। নিলোখেরির বহিরাঙ্গ গঠনের কাহিনী হয়তো শেষ হ'য়েছে, কিন্তু এর নাম তখনই থাকবে যখন এই শেষ অধ্যায়ের পরেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ক'রবে, বৃহত্তর, মহত্তর অধ্যায়ের। এই বইয়ের শেষ অঙ্কে উপসংহারে অল্প কথায় বলবার চেষ্টা ক'রেছি যে অনাগত এক আলোকিত সভ্যতার প্রথম বালকরূপে প্রকাশ পেয়েছিল আমাদের নিলোখেরি। কিন্তু সেকথা বলার আগে কিছু গল্প করা যাক। হয়তো দেখা যাবে এই টুকরো টুকরো গল্পের মধ্যে নিলোখেরির যা দেবার আছে তার অনেক কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৯৪৭ সালে তখন পুনর্বাসন দপ্তরে নর্থব্লক সেক্রেটারিয়েটে ঘোরাফেরা করছি, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম যদি কোন রকমে একটা চেয়ার আর বারান্দার উপরে কয়েক ফুট জায়গা দখল ক'রতে পারি। দেখি মিনিস্ট্রির একজন আণ্ডার সেক্রেটারী (অনেককে ডিঙিয়ে রাতারাতি প্রমোশন পেয়েছেন) আমার দিকে একটা আঙ্গুল নাড়াচ্ছেন অর্থাৎ আদেশ ক'রছেন তাঁর কাছে যেতে। তখন আমার পদমর্যাদার কিছুই ঠিক নেই। যে ডাকে তারই কাছে পড়িমরি ক'রে ছুটি আমি। তাই হাজির হলাম। আণ্ডার সেক্রেটারী মশাই আমার চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস ঘাঁটতে লাগলেন। আগে কি ক'রতাম, বাবা কি ক'রতেন সবকিছু জানা চাই। "ভুল করেছেন খুব" বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন "খুবই ভুল ক'রেছেন

এখানে এসে। গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াতে কি আর হবেন, বড়জোর খুব বেশি হ'লে হয়তো একটা আণ্ডার সেক্রেটারী হ'তে পারেন; তাতে ১২৫০৲ টাকার বেশি মাইনে হবে না।" আমার স্থগঠিত স্থনির্দিষ্ট অতীতকে ঠেলে ফেলে রেখে আমি সরকারের অনিশ্চিত একটি চাকরীর খোঁজে এখানে এসে হাজির হইনি তা তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম ব'লে মনে হ'লো না, বরঞ্চ বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। আর মিনিষ্ট্রির পরিমণ্ডলে আমি একটা বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে রইলাম। তাতে আমাকে ঘিরে যে গোলমাল ছিল তা' বাড়লো বই কমলো না।

প্রথম দিকে সব কাজই আমি নিজে করতাম। স্টেনোগ্রাফার, সরবরাহ সচিব, চিঠিপত্র পাঠানোর ক্লার্ক থেকে শুরু ক'রে মায় অফিস পিওন অবধি। সবই আমি একা। এই সময়ে একদিন একটা মিলিটারী ডিসপোজাল থেকে পাঠানো লরীতে ক'রে দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র আসছিলাম। অনেক লোহার পাত সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম। দিল্লী থেকে ১০ মাইল যেতে না যেতেই গাড়ির একটা চাকা বসে গেল, অথচ তখন দেখি যে গাড়িতে একটা স্টেপনিও নেই, জ্যাকও নেই। ড্রাইভারকে বললাম একটু সামলে চল বাপু, কিন্তু ১৫ মাইল যেতে না যেতেই আর একটি চাকা কুপোকাৎ। তখন বুঝলাম ড্রাইভার গাড়িতে বিরাট বোঝা চাপিয়েছে। নয়টন লোহার পাত আর দশজন অন্ততঃ আড়াইমনি শিখ উদ্বাস্তু। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভার চাপিয়েছে কেন তখন তার জবাব হ'লো যে গাড়িতে আরও ভার চাপাবার মত জায়গা র'য়েছে কাজেই বেশি ভার চাপিয়েছে। একথা বলার কোন মানে হয় না, বুঝলাম তর্ক করা বৃথা। তাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর একটা ট্রাক ধরাধরি করে তাতেই উঠে পড়লাম। গাড়িটা যাচ্ছে পাণিপথ অবধি। পাণিপথ থেকে কুরুক্ষেত্র প্রায় ৪৫ মাইল। ভাবলাম দরকার হ'লে হেঁটেই মেরে দেবো। তারপর দিন মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন সদস্য আসছেন কুরুক্ষেত্র পরিদর্শনে। তাদের আসবার আগে অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে। ভাগ্যে ছিল তাই পাণিপথ থেকে তিন মাইল এদিকে একজন আর্মি অফিসার আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। কুরুক্ষেত্র অবধি পৌঁছে দিতে তিনি রাজী। গাড়ি চলতে না চলতেই বেশ খোসগল্প শুরু হ'য়ে গেল। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন আর

সেখানে যে বাঙালি কমিউনিস্ট তিনি শুনেছেন অদ্ভুত রকমের কাজ কর্ম শুরু করেছেন তার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা ক'রলেন। শুনেছি এত যে কাজ করছে তারজন্য বাঙালি ভদ্রলোক সরকারের কাছ থেকে একটা পয়সা নেয় না। খুব ভাল একটা কাজ করতো সেটা ছেড়ে দিয়ে এসেছে। পুনর্বাসন মন্ত্রী মশাইকে হাত ক'রে ফেলে ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সব বশ করেছে। একবার এদের হাত ক'রতে পারলে তারপর দেশের অন্যান্য জায়গায়ও যে উদ্বাস্তুরা রয়েছেন তাদের মধ্যেও কাজ ক'রতে শুরু ক'রবে। তারপর শুরু হবে তার অভিযান ভদ্রলোকের এই বক্তব্য।

কুরুক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আমাদের সবকিছু পরিকল্পনা মঞ্জুর না করলে একটি পয়সা আমরা বের ক'রতে পারতাম না। তার স্বভাব ছিল আমার যা কিছু প্রস্তাব আসতো তার দিকে দৃকপাত না করা। কোন না কোন ছুতো করে কিছুদিন সব কাজ বন্ধ করে রাখতেন ; মিনিষ্ট্রি আমাকে বুঝতে পারতো না আর কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতো। কিন্তু যেদিন এই অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শুনলেন, আমি তার জয়েণ্ট সেক্রেটারীর বন্ধু, সেদিন থেকে তার ব্যবহার বদলে গেল। ফাইনান্স মিনিষ্ট্রির এই জয়েণ্ট সেক্রেটারী নাকি তার মা বাপ সমতুল্য। কুরুক্ষেত্র থেকে যখন নিলোখেরির জলা জঙ্গলে উপস্থিত হলাম তখন সবার আগে আমাদের চাই তৃষ্ণার জল। ৫০ ফুট ক'রে লম্বা চারটে হ্যাণ্ড পাম্প জুড়ে দিলাম ক্যাম্প অধিবাসীদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন পেশ করলাম এই কাজ করার ও তার জন্য অর্থ খরচ করার মঞ্জুরী চেয়ে। আমার আবেদনপত্র টেবিল থেকে টেবিলে সাঁতরে বেড়াতে লাগলো। ২ বছর পরে একটা বিরাট ফাইলের মধ্যে সে কাগজ ফিরে এলো বিরাট এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে। বক্তব্য এই যে কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছে যে নিলোখেরিতে বহুদিন ধরেই চার হাজার লোক বাস ক'রছেন। এই এতলোক নিশ্চয়ই জল না খেয়ে থাকছে না, কাজেই জলের বন্দোবস্ত যখন রয়েছে তখন আবার চারটে টিউবঅয়েল করার প্রয়োজনটা কোথায় ? মন্ত্রণালয় থেকে এই কার্যকারণ সব তাদের জানাতে বলা হ'লো। আমার জবাব বরাবর যেমন হয় এবারও তেমনি যেটার জন্য আবেদন করেছিলাম তার মঞ্জুরী চাই, ভবিষ্যতে কি ক'রবো তারজন্য নয়। অতীতে যা করে ফেলেছি

তার অনুমোদনের জন্য শুধু চারটে নয়, জল সরবরাহের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য অনেক টিউবঅয়েলই পোঁতা হ'য়ে গেছে। এক মঞ্জুরী দিতে মন্ত্রণা দপ্তর এত সময় নেন কিন্তু নিলোখেরির কাজ চলে অন্যরকমের ঘড়ি ধ'রে। এইবার এলো চোখ রাঙানী—ভীষণ অন্যায় কাজ করা হ'য়েছে। এরকম ভাবে খরচা করা, এরকম অনেক অন্যায়ে এখনও সেই মন্ত্রণাদপ্তর জর্জরিত হ'য়ে আছে।

উপনগরী তৈরি করতে হ'লে ইট চাই, আর দূর থেকে সে ইট আনার কোন মানে হয় না। অথচ যেখানে বাড়ি উঠবে তারই কাছাকাছি ইট পুড়িয়ে নিলে খরচাও কম লাগে, আর ইটের কাজে লোক লাগিয়ে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান করা যায়। কিন্তু কয়লা না হ'লে ইট পোড়াব কি করে? অথচ কয়লা আমরা কিছুতেই পেলাম না, কারণ কয়লার লাইসেন্স যারা বিতরণ করে তাদের মন জুগিয়ে লাইসেন্স যোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। তাই আমরা ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আগুনের বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একদিন পাঞ্জাবের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব নিজের চোখে আমাদের অবস্থা দেখে গেলেন। দেখলেন যে কাঁচাকাঠ দিয়ে আমরা ইটের ভাঁটা জ্বালাচ্ছি। তখনই হুকুম দিয়ে দিলেন যে এক হাজার টন ধুলা কয়লার পারমিট যেন আমাদের দেওয়া হ'তে থাকে যতদিন না তিনি আমাদের হুকুম সরিয়ে নিচ্ছেন। অবশ্য এর পরেও ওয়াগন যোগাড় করতে ১ বছর লেগেছিল। আর মজার কথা এই যে আমরা নিলোখেরির কাজ শেষ করার বহু পরেও কয়লা আসা বন্ধ করতে আরও দ্বিগুণ সময় লেগেছিল।

নিলোখেরি ক্যাম্পে সেদিন যাঁরা কাজে নেমেছিলেন তাঁরা সকলেই সরকারী চাকুরে। অথচ যে কাজটায় আমরা হাত দিয়েছি সেটি মূলতঃ হলো সমাজসেবার কাজ। শুনলাম সমাজসেবার কাজ একমাত্র অবৈতনিক কর্মীরাই করতে পারেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে আহ্বান জানালাম দেশের বিভিন্ন জায়গার সমাজ কর্মীদের। সকলের এই কাজে তারা এসে আমাদের সহযোগী হোন এই ছিল আমাদের কামনা। খুব বেশি রকমের সাড়া পেলাম ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকেই, কিন্তু অবৈতনিক কর্মীদেরও টাকা লাগে, তাদেরও খেতে হয়, শুতে হয়, ঝড়ঝাপ্টার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা

করতে হয়। তাদের থাকার জন্য তাঁবু দিতে হলো, আর খাওয়া-পরার জন্য অবশ্য ধরে দিতে হলো মোটা রকমের জলপানি। যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। সত্যি সে কাজের দাম হয় না! আবার তাদের মধ্যে অনেকে, আর সত্যি কথা বলিতে কি, বেশিরই ভাগই দেখলাম আধুনিককালের মোহান্তগিরিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কাজের মধ্যে শীতের সকালে রোদে ব'সে তেলমাখা আর তারপর প্রাণের ডাকে কি করে কাজ করতে হয় আর এইসব কীটানুকীট বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে যে কিছুই হ'তে পারে না সে সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা। এমনি ভাবে দুটো দলের সৃষ্টি হ'য়ে গেল। একদিকে অল্প বেতনভুক সরকারী কর্মচারীরা আর অন্যদিকে অবৈতনিক কর্মীরা, লেগে গেল সংঘাত। পরিণতিটা চরমে দাঁড়ালো যখন একজন বৌদ্ধ সাধু এসে হাজির হ'লেন। আমি ভাবলাম আমি তাঁকে চিনেছি, তিনি ভাবলেন তিনি আমাকে চিনেছেন। তিনি থাকতেন অবৈতনিক কর্মীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে অনেক দূরে। ভাবখানা যেন তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি হ'য়ে গেছে। তাঁর কাজ হিসেবে তিনি বেছে নিলেন আমার গুরুগিরি করা, আর নিলোখেরির লোকেদের চরিত্র সংশোধন করা। এরপর এই অবৈতনিক কর্মীদের আর ঐ বৌদ্ধ সাধুকে সরাতে গিয়ে কি নাকানিচোবানিই না খেলাম।

আমার মনে হয়েছিল বর্তমান সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে তখন আমার কাজ একেবারেই চলবে না। একজন সত্যিকারের কাজের সিভিল ইঞ্জিনীয়ার খুঁজছিলাম যিনি ব্যক্তি ও সমাজের সত্যিকারের গঠন করতে পারবেন। আর কাজ শুরু করতে হবে তাকে একেবারেই শুধু হাতে। পি, ডব্লিউ, ডির সাধারণ ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে সে কাজ চলবে না। যে রকম লোক খুঁজেছি সেদিন তাদের খুঁজে পাওয়া ভার, আর বিশেষ ক'রে স্বাধীনতার ঠিক পরেই। একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলাম। ঠিক কি লিখেছিলাম মনে নেই, কিন্তু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট—এ, কোয়েস্ট বইতে মোটামুটি সেরকমই আরেকটা লিপি প্রকাশ করেছিলাম। সেটা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

হাতে যদি প্রচুর যন্ত্রপাতি আর মশলা থাকে তাহলে শহর, বাড়ি, কারখানা, তৈয়ার অসম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে যা লাগে তা পাওয়াও সহজ হ'য়ে আসে। কিন্তু যখন বাহ্যিক বস্তু নয় মানুষ তৈয়ার করতে যাওয়া হয় তখন

একটু অস্থবিধা হয়ই, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে দিলেও বোধ হয় তা করা যায় না। মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে সে উৎপত্তি প্রেমেরই ফল। প্রথম জীবনে ভালবাসা দিয়েই তাকে গড়ে তুলতে হয়। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এই যে এ পরম গুণটুকুর এক পয়সা দাম নেই, কিন্তু জগৎ সংসার চলে তারই কেরামতিতে। দানেই প্রেমের ঐশ্বর্য, অপহরণে দৈন্য। যারা দেবে অথচ নেবে না, তাদের একান্ত ভাবে খুঁজছি। কর্মখালি এমন লোক চাই যে প্রেম দিতে পারে।

এমনলোক চাই যে মানুষ তৈয়ার করতে পারে।—গোটা ছয়েক আবেদন-পত্র এলো। তার মধ্যে কোনটাই বিশেষ কিছু স্থবিধার নয়। তখন ১৯৪৮ এর মাঝামাঝি। একদিন অফিসে ব'সে আছি, একজন ইঞ্জিনীয়ার এসে হাজির হ'লেন। তার নাম বি, ডি, নন্দ। কাকে চাই প্রশ্ন করাতে জবাবে জানালেন যে ঐ বিজ্ঞপ্তিটি দিতে যার সাহস হ'য়েছে তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চান। তিনি কিন্তু আবেদন করেননি। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো! পরিশেষে ঠিক হলো যে তিনি কাজে যোগ দেবেন। অন্য সব কথাবার্তাও হয়ে গেল। ধুলো থেকে গড়া হলো নিলোখেরি উপনগরী। নিলোখেরির বহিরাঙ্গের রূপ অনেকখানিই তার কীর্তি।

যখন আমাদের সম্বল ছিল শুধু কতকগুলি বেল দড়ির তাঁবু, তখন শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি করা গিয়েছিল, সবাই একরকম তাঁবু পেয়েছিলেন। এমনি সময় কতকগুলি সার্জেণ্টের তাঁবু এলো, গোলমাল শুরু হ'য়ে গেল তখন অযাচিত ভাবে। যার যা ক্ষমতা সে তেমন ভাবে বুঝে নেবে এই তত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ, কিন্তু যার যা প্রয়োজন সে তেমনি বুঝে নেবে এই দিয়ে শেষ হলেও এই তত্ত্ব কথাটি কাজে খাটানো বড় কঠিন। এই নতুন টেস্ট নিয়ে খুব মন কষাকষি শুরু হ'লো। ব্যাপারটা সামলানোর জন্য আমি নিজে সার্জেণ্টের তাঁবু ছেড়ে বেল দড়িতেই ঢুকে পড়লাম। বাসিন্দাদের নিয়ে একটা কমিটি করে দিলাম। তাদের উপরই বাকী তাঁবু বিতরণের ভার পড়লো, যার যেমন দরকার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। বর্ষাকালে আমাদের উপনগরীর এঞ্জিনীয়ার সস্ত্রীক কিছুদিন এখানে থাকবেন বলে এসেছিলেন। তাঁবুতে মাটি-কাদা থেকে খাটিয়াগুলো একটু উপরে ওঠবার জন্য উনি এক একটা পায়ার তলায় এক একটা ইট বসালে ভাল হয়

ভেবেছিলেন। এতে এই কাজে ১৬খানা ইট লেগেছিল। আর যাবে কোথায়! এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই সমস্ত কলোনীতে কি হৈ হৈ। ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী কোন অধিকারে বিনা পয়সায় তাঁর যত প্রয়োজনই হোক না কেন ষোলখানা ইট গুদোম থেকে নিয়ে গেলেন—এই প্রশ্ন সকলেই করতে লাগলো। ব্যাপার অবশ্য বেশি দূর গড়াতে পারলো না। কারণ এঞ্জিনীয়ারের কাছে খবরটা যাওয়া মাত্র তিনি সকলকে খুসি ক'রে দিলেন তাদের মনমত কাজ করে। এন, ডব্লিউ, এফ, পি থেকে উদ্বাস্তু হ'য়ে অনেকেই এসেছিলো। দেশে তারা মাটির বাড়িতে থাকতো আর বাড়ির ছাদে সর্ষে বিছিয়ে রাখা হ'তো। নিলোখেরির বাড়িগুলো সবই এক রকমের ফ্ল্যাট স্টাইলের সাধাসিধে ধরনের। যদিও বহুদিন ধ'রে এসব বাড়িতে এরা বাস করছে তবু ছাদের উপরে সর্ষে রাখার পুরোণো স্বভাব এদের আর গেল না। অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য রাতারাতি স্বভাব বদলানো সম্ভব নয়। আমাদের তাঁবু শহরে একটা চাকুরী সংস্থান কেন্দ্র বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। আর সকলকে কাজ সমভাবে বণ্টন করার দরকার ছিল বলে একটা যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রয়োজন হ'য়েছিল। আমাদের উপনগরীর স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভাগটির উপর পড়লো কর্মসংস্থান করার ভার। যোগাযোগ করার ভার যাদের উপরে পড়েছিল তারা এই সুযোগে ছড়ি ঘোরাতে লাগলো। কারণ কাজ যোগাবার একচেটিয়া অধিকার তাদেরই হাতে দেওয়া হ'য়েছিল। কিছুদিন পরে বোঝা গেল এ চলবে না। এ দায়িত্বটির বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। তখন এদের কাজ শুধু এই হবে বলে বেঁধে দেওয়া হ'লো যে তারা কর্মপ্রার্থীদের একটা নামের হিসাব রাখবে। কাজ দেবার ভার আর তাদের উপরে থাকলো না।

আমাদের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষণকেন্দ্রগুলি ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য প্রচুর কাঠের দরকার ছিল। অন্য সব জিনিসের চেয়েই বেশি পরিমাণ কাঠ সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ ক'রেছি। কিন্তু কাঠ সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। তাই এত কাঠ কিনতে গিয়ে একটা বড় লোকসান না ক'রে বসি। একটা সোজা মতলব মাথায় খেললো। পার্শ্ববর্তী একটি রাজ্যের চীফ কনজারভেটরকে অনুরোধ ক'রলাম যে যে কাঠ তাঁর সবচেয়ে ভাল মনে হয় সেরকম কিছু কাঠ আমাদের প্রথম কাজের জন্য পাঠিয়ে দিন। ভদ্রলোকের তখন প্রায় অবসর গ্রহণের সময়। ভালমন্দ ভাল ক'রে

বিচার না করেই পাঠিয়েছিলেন সেবিষয়ে একেবারে সন্দেহ নেই। কারণ মাল যখন হাতে এলো তখন দেখি তার অর্ধেকের উপর হ'লো যা আমরা চেয়েছি তার থেকে অনেক নীচু স্তরের কাঠ আর বাকী অর্ধেকের অর্ধেক প্রায় নষ্ট অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। এদিকে সরকারের তরফ থেকে চীফ কনজারভেটর স্বয়ং এ অর্ডার পেশ ক'রেছেন ক'রবার কিছু নেই। তার নিজের লোক সরাসরি ডিপো থেকে বেছে এনেছে, কিন্তু আমরা বেঁকে বসলাম দাম দেবো না। তখন চীফ কনজরেভেটরের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে তখন যিনি এ কাঠের ঠিকাদার তিনি নিজেই এসে হাজির হলেন নিলোখেরিতে আমার অফিসে। বিরাট ঠিকাদারী ব্যবসা নাম করা লোক, অনেক তার দান-ধ্যান—এমনকি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের একটা খেতাবও পেয়েছেন তিনি, ঘরে যখন ঢুকলেন সঙ্গে দশ হাজার টাকা ক্যাশ হাতে নিয়ে আমাকে বললেন আমার অপূর্ব ত্যাগ, চরিত্রের মহত্ত্বের কথা অনেক শুনেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য আমার দান স্মরণ করে আমার হাতে টাকা কটা তুলে দিতে চান, আমি যেরকম ভাল বুঝি, যে কাজে আমার প্রাণ চায় সেই কাজে যথেচ্ছ ঐ টাকার যেন আমি সদ্ব্যবহার করি। ঘৃণার সহিত মহাপুরুষটিকে কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম কিন্তু কাঠের ব্যাপারে আর কিছু করা গেল না। পরে শুনেছি যা ঘটেছিল তা নতুন কিছুই নয় সরকারী ব্যবসায় হামেশাই এরকম হ'য়ে থাকে।

নিলোখেরির শিল্পগুলি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেবার আগে সেগুলো সরকারের দ্বারা পরিচালিত হ'তো। উপরওয়ালা কর্মচারীরা সরকারী বেতনভুক ছিলেন। যখন এগুলি সমবায়ে পরিণত করা হ'লো তখন উপর ওয়ালা ও অধ্বস্তন কর্মী উভয়ে নতুন সমবায়ের সমমর্যাদাভুক্ত সদস্য হ'য়ে গেলেন। এরপর ফাঁকিবাজ ও অলস কর্মীদের বিরুদ্ধেও উপরওয়ালাদের আর কিছু বলা অসম্ভব হ'য়ে গেল, কিছু বললেই কর্মীরা রুখে দাঁড়াতে।

ভারতবর্ষের লোহা ও স্টীলের বরাবরই ঘাটতি। সি, জি, আই শীট ও স্টীলের পাতের জন্য কোটা সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের টিনের কামার-শালায় কাজে লাগবে বলে। ভেবেছিলাম যে আমাদের কর্মী ও তাদের পরিচালকরা কাজ শিখে নেবে ও তার সুদক্ষ কাজের দ্বারা লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবে। কিন্তু কষ্টার্জিত সি, জি, আই শীট ইত্যাদির জন্য জিনিসের যা লাভ তাদের দেখলাম সেইটাই সম্বল। বড় বড় ট্রাঙ্ক তৈরি হলো তাতে লোহা

লাগলো প্রচুর কিন্তু তা তৈরির মধ্যে চমক কিছুই নেই, এগুলো বিক্রি হতো অনেকটা লোহার দামে—ভারে কাটতো ধারে নয়। কোরিয়ার লড়াই শেষ হবার পরে এই সব লোহা ইত্যাদির অনটন আর থাকলো না। আমাদের টিন কামারশালাটি ব্যবসার ক্ষেত্রে প'ড়লো পিছিয়ে। এদের হাতে লোহা ও টিন এবং অর্ডার পাওয়ার কমতি ছিল না। তবু একের পর এক দোকান গুটিয়ে যেতে লাগলো। রাতারাতি যারা বড় লোক হয়েছিল রাতারাতি তারা পাত্‌তাড়ি গোটালো!

কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন তার নামটা ধরা যাক ঋষি নারদ, কারণ নারদ মুনির মতই তার ব্যবহার। দেখতে সুন্দর, অবিবাহিত, লম্বা চওড়া, ফর্সা। শিল্পীর মত মন অথচ অকলঙ্কিত দৃঢ় চরিত্র। আমি শীঘ্রই লক্ষ্য করলাম যে পার্থিব অন্য কিছুর ওপর মোহ না থাকলেও সমবেত গঠনমূলক সংশ্লিষ্ট কাজে সে বিপদজনক হতে পারে। সে এ্যালসেশিয়ানের মত বিশ্বস্ত, কিন্তু সে চায় না যে তাকে অতিক্রম করে অপর কেউ প্রভুর বিশ্বস্ততা অর্জন করে। সকলকেই তার মাধ্যমে পৌছাতে হবে কর্তার কাছে। নিজেরই মত অতি ভাল বেশ কয়েকটি সাঙ্গপাঙ্গ তার জুটে গেল কদিন যেতে না যেতেই। সর্বরকম মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতা থেকে তারা সকলকে মুক্তি দিতে চায়। বিরাট পবিত্রতায় উজ্জ্বল ক'রে তুলতে চায় সকলের চরিত্র। কিন্তু আমাদের নিলোখেরিতে সাধু ও শয়তান উভয়কেই আশ্রয় দিতে হবে। সকলে মিলিত হ'য়ে একটা সাধারণ সত্ত্বা উপলব্ধি করবে। এ-রকম নিলোখেরি আরও অনেক হবে সর্বত্র তাই আমরা চেয়েছি। আশ্রম বানাতে বসিনি। এই মহাপুরুষরা নিলোখেরিতে বিশেষ কোন ছাপ ফেলতে পারলো না। বরঞ্চ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার অসুবিধাই সৃষ্টি করতে লাগলো। লোকদের নিয়ে অসুবিধা আরও অনেক ভোগ করেছিলাম কিন্তু বোধ হয় এদের কাছ থেকে যতটা পেয়েছি ততটা নয়।

নিলোখেরির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা বিভাগ নামে একটি কার্য-বিভাগের সৃষ্টি হ'য়েছিল। স্থানীয় সম্পদের উপরে ভিত্তি করে এই বিভাগের মাধ্যমে আমরা কৃষি, পশুপালন, হস্ত চালিত ও গ্রামীন শিল্প রচনার প্রচেষ্টা ক'রেছিলাম। স্থানীয় কর্মীদের লাগানো হ'য়েছিল এই কাজে। উৎপন্ন

দ্রব্য বিক্রী হ'তো স্থানীয় বাজারে। নিলোখেরিতে একটা ভাল ডেয়ারী ছিল। কর্ণাল সরকারী ডেয়ারী ও মহিষ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সযত্নে সংগৃহীত গরু আর মহিষ নিলোখেরির জন্য আমরা জোগাড় করেছিলাম। আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত দুধ ছিল, সেই দুধ থেকে খাঁটি মাখন তৈরি করে আর দিল্লীর খাঁটি গুণগ্রাহীদের কাছে সরবরাহ শুরু করে দিলাম। নিলোখেরির ঘি'র নাম তখন বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন অনেকেরই এঁদের মতামত ও সহযোগিতা নিলোখেরির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। মাখন তোলা দুধটা নিয়ে তখন কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়া গেল। নিলোখেরির কেউ এই দুধ ছোঁবেন না। সেই দুধ তাই শূয়োরদের ভোগে লাগলো আর লোকমুখে স্বয়ং সম্পূর্ণতা বিভাগের নতুন নাম ছড়িয়ে পড়লো। সেটি হ'লো 'শূয়ার ব্যবস্থাপক বিভাগ'। এই শূকর বাহিনী ও তাদের পরিচালকদের প্রতিপালনের জন্য কম ক্ষতিস্বীকার করতে হয়নি আমাদের। আমাদের এই ডেয়ারীর পার্শিয়ান হুইল চালাতো একটা উট। একদিন দেখি পশুটা রাস্তায় মরে পড়ে আছে। একজন দিনমজুর সেখানে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম যে উটটা মরলোই-বা কি করে আর রাস্তার উপরে এমনভাবে পড়ে আছে কেন? কিছু নতুন কথা না হলেও জবাবটা তার আশ্চর্য বটে। বললো সরকারী উট তাই সরকার-ই বলতে পারবেন এটা মরলো কি করে। আর কখন রাস্তা থেকে তুলে এর সদ্গতি করা হবে তাকে এ প্রশ্ন করাতে সে হতবাক। কাজ তো তার দিনমজুরী—উটগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের ভার তার ওপর দেওয়া হয়েছিল।

যখন উৎপাদন কাজের বেশির ভাগটাই হ'তো হাতের গুণে তখন উৎপাদনের গতিও ছিল শ্লথ, আর যা প্রস্তুত হ'তো তা বিক্রী করারও অসুবিধা ছিল কম। আর কর্মীদের রোজগারও তাদের হাতের দক্ষতার উপরে অনেকটা নির্ভর ক'রতো। এই সময়ই জার্মান রিপারেশান কেন্দ্র থেকে প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটা যন্ত্র পাওয়া গেল। এর জন্যে আমরা তখনও প্রস্তুত ছিলাম না শুরু হলো সমস্যা। এই যন্ত্রের প্রথম স্পর্শ লাগে কাঠের কাজের কারখানাটায়, এইটাই সেদিন আমাদের সব চেয়ে বড় শিল্প কেন্দ্র। যন্ত্র-সম্বলিত ছুতোর কারখানাটায় যতদিন আমাদের স্থানীয় চাহিদার চেয়ে খুব বেশি জিনিস প্রস্তুত করেনি ততদিন বেশ আরামেই ছিলাম। এদের যা পড়তা হ'তো তা দিয়ে

এরা বহু সুদক্ষ, অদক্ষ ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ব্যবস্থাপক কর্মীর ভরণ-পোষণ করতে পারতেন ভাল ভাবেই। কিন্তু আস্তে আস্তে যেই আমাদের উপনগরী থেকে কাঠের কাজের চাহিদা কমতে লাগলো, আমাদের ঘরে তখন লালবাতি জ্বলে এমনি অবস্থা। কাঠের কারখানায় তখন উৎপাদন চলেছে তড়িৎগতিতে। যা কিছু তৈরি হচ্ছে তার সবটা ব্যয় করার মত প্রয়োজন আমাদের উপনগরীর সেদিন ছিল না। সবটা মাল নিঃশেষিত হতে হলে উপনগরীতে নতুন কাজে হাত দিতে হতো। অন্যান্য যে সব উপনগরীগুলি আশে পাশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তারা নিলোখেরি থেকে কিছু'নিতে রাজী নয়। তাদের আদান-প্রদান অন্যত্র। হস্ত দ্বারা উৎপাদন ও ব্যাপক উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান যে দুস্তর তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। একটার জায়গায় আর একটা এনে বসাতে হলে সে কাজটা সংগঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে ধীরে—স্বাভাবিক ভাবে। আর এর সমাধান যদি তরান্বিত করতে হয় তবে তা জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তির উপরেই করতে হবে। 'কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তুলতে হবে তার চাহিদা। নিলোখেরিতে তখন উৎপাদনের হার এমনি বেড়ে যাওয়াতে আমাদের শ্রমিকসমাজে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। নিলোখেরি কোনরকমেই এই উৎপাদনের সুব্যবস্থা ক'রতে পারিনি। এই যন্ত্রগুলি আর শিল্পীদের পেট ভরাতে গিয়ে সব সম্পদ ব্যয় হ'য়ে গেল। শ্রমিকরা আগে যা পাচ্ছিলেন কারখানায় যন্ত্র আসার পরে তাদের সে পড়তাটুকুও মিলিয়ে গেল। আমাদের যন্ত্রচালিত ছুতোর কারকাখানাটি এই বর্ধিত উৎপাদন সমস্যার কবলে হ'লো প্রথম বলি।

আগেই বলেছি যে নিলোখেরিতে পুলিশ আদালতের চল ছিল না। কলহ বিবাদ যা হ'তো তা বাদী-বিবাদী নিজেরা মিলেই মিটিয়ে ফেলতেন নয়তো স্থানীয় পঞ্চায়েত বা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে মিটে যেত। একবার দুই দল শিখ খুব লড়াই বাঁধালো নানারকম অস্ত্র মায় কুড়ুল অবধি নির্বিবাদে চালালো একপক্ষ আরেক পক্ষের উপর। হতাহতদের সংখ্যা দেখে আর সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে আমি ধৈর্য রাখতে পারিনি, রেগেমেগে পুলিশেই খবর দিয়ে দিলাম। কিন্তু ততদিনে নিলোখেরির সামাজিক দৃঢ়তার কথা পুলিশের কানে গিয়ে পৌছেছে, হাতজোড় করে আমার অফিসে এসে পুলিশই প্রস্তাব ক'রলো যে ব্যাপারটা কোর্ট অবধি না গড়াতে দিয়ে বাইরে বাইরে তারা মিটিয়ে ফেলতে

চায় আমি যেন মত দিই। সন্ধ্যে হতে না হতে দেখি আবার চারিদিক ভাই ভাই ভাব আর একদল অপর দলের আহতদের সেবার কাজে লেগে গেছে। শান্তি ও সৌজন্যতার প্রতীক এলাচি ও মিছরী বিতরণও শুরু হ'য়ে গেল। তার ভাগ থেকে অবশ্য পুলিশরাও বাদ পড়েনি।

ধর্ম না হলে বুঝি মানুষ বাঁচতে পারে না। আর বেশির ভাগ লোকেরই কাছে ধর্ম শুধু একটা ব্যক্তিগত বিষয় নয় এর বহিঃপ্রকাশের একটা সুযোগ তাদের চাই। দু'তিন দিনের মধ্যেই তাই শিখরা একটা গুরুদ্বার, আর্য-সমাজের মন্দির ও সনাতনীরা পৃথক আর একটি মন্দির চেয়ে ব'সলো। নিলোখেরির ধর্ম সেদিন ছিল 'তব্বর' অথবা নিলোখেরি নামক যৌথ পরিবারের ধর্ম আর কাজের ধর্ম। এই কাজ না হ'লে 'তব্বর' বিনাশ হ'য়ে যেত। আমি ভীষণ ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তবু এদের কথায় রাজী হ'য়ে গেলাম একটা শর্তে যে এই বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটির পর একটি পাশাপাশি বসাতে হবে। আজ প্রায় দশ বছর হ'য়ে গেল মন্দির আর গুরুদ্বার নিলোখেরিতে পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে। একযোগে কাজ করে চ'লেছে তারা একদিনও তার ত্রুটি হয়নি। সাম্প্রদায়িক মিলনের জাগ্রতরূপ এই নিলোখেরিতে আজও দেখা যাবে। নিলোখেরিতে একবার একটা বিয়ে হ'লো! মজার গল্প। মেয়েটি আমাদের নার্শারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সন্ধ্যে নাগাদ বর এসে পৌছালো মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। তার বয়স দেখে নিলোখেরির অনেকেই একটু সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়লো। বিশেষ কিছু হৈচৈ না করে তারা কন্যাপক্ষকে মধ্যরাত্র অবধি বিয়েটা স্থগিত রাখতে বলে ট্যাক্সি নিয়ে দিল্লী এসে হাজির! প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি তারা ফিরে এলে আর তাদের খবর হ'লো যে বরবাবাজীর আরও একটি স্ত্রী এখনও জীবিত ও তার সঙ্গে বসবাস করছে। বিয়ে ভেস্তে গেল। বিবাহের জন্য বধূবেশে সে তখনও সজ্জিতা। এই দুর্লক্ষন, এইভাবে ঘটনার পরিসমাপ্তি দেখে তার সেদিন কি কান্না। সবাই মিলে তখন লেগে গেলেন তার জন্য নতুন একটি পাত্রসংগ্রহের কাজে। ভালভাবেই বিয়ে হ'য়ে গেছে তার। আজ সে সুখে সংসার করেছে।

সপ্তাহের ছয়দিনই নিলোখেরিতে আমার অফিসে, আমি সকাল থেকে অনেক রাত্রি অবধি কাজ করতাম। কলোনীর চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতাম কিন্তু

রবিবারদিন আমার নিজের কাজ করতাম। চাষ করতাম সেদিন—নিজের সঙ্গে নিভৃতালাপে রপ্ত থাকতাম। আর নিলোখেরি নামক আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য যা কিছু লিখতে চাই তারও মালমশলা প্রস্তুত ক'রতাম সেদিন। এই কুরুক্ষেত্র কাগজে নিলোখেরিবাসীদের জন্য সেদিন এই মর্মে নোটিশ জারি করেছিলাম। পাঠকদের অবগতির জন্যে তা উদ্ধৃত করা গেল :—

নিলোখেরিবাসী আমার বন্ধু ও কমরেডদের তাই জানানো হ'চ্ছে যে সরকারের সেই অবৈতনিক টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসার যার উপর উপরোক্ত দায়িত্বগুলি পালন করার ভার পড়েছে হপ্তার ছদিনই সকাল নটা থেকে রাত্রি দশটা অবধি নিলোখেরির অফিসে এখানকার অধিবাসীদের সেবার কাজে তাঁকে পাওয়া যাবে। নটার আগে ও দশটার পরে তাঁকে পাওয়া যাবে তাঁর তাঁবু সংলগ্ন আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলায়। এই নিভৃত আবাসে তাদের সাদরে তিনি ডাক দিচ্ছেন সকল স্ত্রী-পুরুষকে যারা ১৯৪৯ সালের বাসিন্দা আর ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টে ভারতবর্ষে যে ছোট্ট ঘটনাটি ঘটেছে সে সম্বন্ধে যারা সচেতন। আজকের পৃথিবীতে স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যারা উন্মুখ তাদের সকলকে। তাঁকে পথ দেখাতে পারে, ভরসা দিতে পারে প্রাণে এমনি বন্ধু ও কমরেড তাঁর চাই। এদের খোঁজে তিনি হাহাকার করে বেড়াচ্ছেন। হয়তো কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এই ত্রুটির জন্য তিনি সদাবনত, এই দূরত্বটুকু পার হওয়া অসম্ভব নয়। অন্ততঃ সকলের পক্ষে তো নয়ই। একদিন কেউনা কেউ এই দূরত্ব পার হ'তে পারবে এ ভরসা তাঁর আছে।

রবিবারদিন আমার নিভৃতে এর পর আর কেউই হানা দেয়নি। বরঞ্চ নিলোখেরির প্রতিটি বাড়িতে এরপর রবিবার বাবা, মা, ছেলেমেয়েরা মিলে এক একটি বাগান তৈরির কাজে লেগে গেলো। তাছাড়া রবিবার প্রত্যেক বাড়িতেই পরিচ্ছন্নতা দিবস পালিত হ'তো। নিজেদের চারিদিকের আঙিনা, কাপড় চোপড়ের পরিষ্কার করা হ'তো এইদিন। প্রতি রবিবারে এই সব করা প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পর্যবসিত হ'য়েছিল।

নিলোখেরিতে বাইরের থেকে যখন কেউ আসতো সমস্ত উপনগরীটা যেন এক পরিবারে পরিণত হ'ত। প্রত্যেক পরিবারই অভ্যর্থনার পূর্ব-নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী কাজে লেগে যেত। প্রত্যেকটি বাড়ি

পরিষ্কার করা হ'ত। অভ্যর্থনার কিছু না কিছু দায়িত্ব সব পরিবারের উপরেই গিয়ে পড়তো। এখানকার অধিবাসীরা জানতো যে বাইরের থেকে এসেছে সে ঘুরতে ঘুরতে যে কোন বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। আমাদের উপনগরীতে যখন লোকেদের মধ্যে দলীয় কলহ হ'তো বা শাসন-যন্ত্রটার সঙ্গে অধিবাসীদের সংঘর্ষ লাগতো তখন বাইরের থেকে প্রিয় কাউকে এনে ফেলতে পারলেই থেমে যেত সব দ্বন্দ্ব! বিবাদ মিটানোর কাজ এতে খুব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হ'তো। আমাদের জানা ছিল যে এখানে একদিন মিউনিসিপ্যালিটি বসবে আর তার ভার আমাদেরই বহন করতে হবে, তাই একটা মঙ্গল তহবিলের সৃষ্টি করা হয়েছিল। যার যা রোজগার তার থেকে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু দিয়ে রোজগারী উপনগরীবাসীরা এই ফাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলো। সমাজে যারা অনুন্নত সম্প্রদায় তাদের দেখাশুনার জন্য খোলা হয়েছিল আরও একটি তহবিল। এই মজদুর মঞ্জিল ফাণ্ডে সকলেই মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়েছিলো—বিশেষ করে যাদের রোজগারটাই ছিল বেশির দিকে। কিছুদিন পর এই তহবিল সংগ্রহের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। কারণ উপনগরী চালকদের হাতে তখন আরও অনেক কাজ। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য গঠন-মূলক কাজ সংগ্রহ করে দেবার কাজেই তাদের সব শ্রম লেগে যেত। কিন্তু সমাজজীবন যাপনের উপযোগী সাহায্যাদি চালানোর কাজে মঙ্গল তহবিলটি আরও বহুদিন লিপ্ত ছিলো!

এমনি করেই নিলোখেরি একদিন বিখ্যাত হ'য়ে পড়লো। মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়লো তার খ্যাতি। দূর দূর থেকে পথচারী বেদেরা হানা দিতে লাগলো এই নব নির্মিত নগরীর প্রাকারে। এক মর্মস্পর্শী কাহিনী বলি। "ছায়ার ঘোমটা" এই নামে ঘটনাটির বিবরণ কুরুক্ষেত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল :—

এক রবিবার আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংলগ্ন নিলয়ে সে এসে হাজির। অঝোরে কাঁদছে সে। বেদে কন্যা, কোলে তার এক বছরের শিশু সন্তান আর ছেঁড়া কাঁথা পরা তিন বছরের একটি ছেলে। পিছনে বহু ভারে নুয়ে পড়া তার স্বামী। কাঁদে তো কাঁদেই। দু' বছরের তার একটি মেয়ে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা জল আনতে গিয়ে হারিয়ে গেছে। সেই সময় খোঁজ নিয়ে জানলাম নিলোখেরির কাছাকাছি একটি মরুরাজ্য থেকে তাদের আগমন। আকালের ভয়ে একমাস পায়ে হেঁটে আরও ছয়টি পরিবারের সঙ্গে এসে ভীষণ

শীতে খোলা আকাশের তলায় আস্তানা গেড়েছিল। এরপর জল আনতে গিয়েছে মা নিকটবর্তী এক গ্রামের কূয়োতে। ছেলেটা পিছন পিছনই আসছিল। অজানা অচেনা গ্রামে একটু জলের জন্য তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রায় একঘণ্টা। যখন ফিরলো তখন দেখে ছেলেটার কোন খোঁজ নেই। ক্ষুধার্ত পিতা আশেপাশে ঝোপঝাড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো। তারপর আর কোন উপায় নেই—শৃগাল সন্তান নিয়ে উধাও হয়েছে এই স্থির ক'রে হাল ছেড়ে দিলো। সন্ধ্যেবেলায় অবস্থা চরমে উঠল। একদল ডাকাত বাপ বেচারাকে মেরে ধরে তার সংগের গাধাগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই গাধাগুলিই ছিল তার জীবিকা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন।

ইতিমধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। দু' বছরের শিশু ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা হাওয়া ও বরফ কুচির ঝড়ের মধ্যেও মরেনি—দু ফার্লং দূরে একটা ঢাক গাছের গোড়ার উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। গায়ে ছিল তার মাত্র ছিন্ন ভিন্ন একটা সার্ট। মা তখনও কাঁদছে—দুমড়ে পড়া গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। বাবা একটু দূরে হাসবে কি কাঁদবে তা তার ঠিক জানা নেই। কারণ আর একটা প্রাণীর আহার যোগাতে হবে তাকে। সামনে তার এই দায় তাই বুঝি সে হতবাক।

নিলোখেরির এই রকম কাজের গোলমাল ওধারে বেড়েই চলে। বাস্তু-হারাদের বাসকেন্দ্র এই ক্রমশ তার রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। কি ভাবছে বেদের মা—আবার জন্মাবে, মহত্তর জীবন পাবে কি সেবার।

আমি নিলোখেরি ছেড়ে আসার বছর খানেকের মধ্যেই আমাদের ক্যাশিয়ার, ভদ্রলোক খুবই বিশ্বাসী লোক ছিলো হঠাৎ একটা টাকা আত্মসাৎ করার মামলায় ফেঁসে গেলো। শুনলাম তাকে জুয়ার নেশায় ধরেছিল। জেলে না যাওয়া অবধি জুয়াড়ীর জুয়াড়িত্ব ঘোচে না লোকে তাই বলে। লোকটা ৩০,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ ক'রে বসলো—জুয়ায় জিতে শোধ দেবে এই ভরসায়। যখন ব্যাপারটা প্রকাশিত হলো আর কোর্টে কেস উঠলো কলোনীর সকলে উঠে পড়ে লেগে গেলো টাকাটা কোন রকমে জোগাড় করে তাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য। তাদের ধারণা লোকটা হঠাৎ অসৎসঙ্গে পড়েছে। আর প্রথম জানা গিয়েছিলো যে গোলমালটা মাত্র ছয় হাজার টাকার—এ টাকাটা হয়তো তুলে দেওয়া যেত। ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক অবশ্য বুদ্ধি করে

সকলকে প্রথম থেকেই বুঝিয়ে বলেছিলো যে ব্যাপারটা অনেক টাকার। এত টাকা জোগাড় করা অসম্ভব। সেই সময়ে নিলোখেরি সমাজের লোকেরা অর্থ আহরণের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি, কিন্তু হলো না কিছুই। বহুদিন ধরে কেস চললো আর ক্যাশিয়ারের হ'য়ে গেল সাত বছরের জেল।

যখন কোন ব্যাপারে মনোকষ্ট পেতাম কিংবা হাতড়ে হাতড়েও ঠিক পথটির সন্ধান দেখতে পেতাম না, কখনও বা মনে হতো যে উপনগরীর বাসিন্দাদের কাছে যা চাই তা পাচ্ছি না। এই সব পরিস্থিতির সমাধান আমি করতাম। সবাইকে একত্রে জড় করে একটা মিটিং ডেকে সেখানে আমার যা মনে হতো বলে যেতাম আর সকলেই যার যা মনে হতো সেই রকম স্বাধীন ভাবে পেশ করতো। এমনি ভাবে কত দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার সমাধান হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রায় ছয়বারেরও বেশি অনশনও করতে হয়েছে, সময় সময় এক নাগাড়ে সাতদিন অবধি মৌন থেকেছি। সবই সমস্যা সমাধানের জন্য। অনশন যখন ক'রতাম তখন কোন শর্ত জুড়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলাম আমি। কুরুক্ষেত্রে প্রকাশিত একটি অনশনের বিবরণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম :—"নিলোখেরির বন্ধু ও কমরেডগণ আজ আমার মনে শান্তি নেই। যিনি আমার প্রভু তাঁকে আমি বুঝিয়েছিলাম যে এই নিলোখেরির পুণ্য ধূলিতে আমি ভারতভূমির আত্মার পুনরুত্থানের যে পরম প্রশ্ন তার জবাব খুঁজে পেয়েছি—তাই তিনি নিলোখেরিতে এই পরীক্ষাগার সৃজন করবার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। নিলোখেরির নূতন পথে এগিয়ে যাবার উপযোগী মশালবাহী একদল কর্মীর সৃষ্টি আমি ক'রতে পেরেছি। কাজের অগ্নিক্ষেত্রে তাদের দীক্ষা ঘটেছে এই জঙ্গলাকীর্ণ বাসভূমিতে। তাই চিন্তার ও কর্মের সর্বরকম ক্ষুদ্রতা থেকে তারা আজ মুক্ত। তাদের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হ'তে চলেছে। নিলোখেরি হবে এই আন্দোলনের মধুচক্র।

এদিকে নিলোখেরি সেদিন একটা নতুন মহাধিকরণে পরিণত হ'তে বসেছে। দিল্লীর মহাধিকরণের চেয়েও কঠিন তার কাঠামো। কি জোরেই না তখন নিলোখেরিতে বৃষ্টি আসতো! লোকজন, জন্তু-জানোয়ার ছুটতো এতটুকু আশ্রয়ের খোঁজে। এদিকে নিলোখেরির যারা মহাজন নেতৃবর্গ তাদের উপরে আমার সেদিন কত ভরসা, তারা রক্তচোখে একজন আরেক জনের

দাড়ি উপড়োচ্ছে—কার উপরে টেক্কা দেওয়া, কার কত ইঞ্চি অধিকার বেশি সেটা ঠিক করার জন্য। এদিকে যন্ত্রণায় ছটফট করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা। অমূল্য জানোয়ারগুলি মরছে—খাদ্য নেই আশ্রয় নেই। চারিদিকে কিন্তু নিলোখেরির ভবিষ্যৎ কি এই তত্ত্ব নিয়ে তর্ক ও আলোচনা উত্তাল হ'য়ে ওঠে। বাবুলোকদের মজা সেদিন কে দেখে। তবু একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্রোতধারার ছাপ পড়েছে এই নিলোখেরিতে। দরকার হ'লে আজ একপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে নিলোখেরি। তাই চারিদিকে এই কদাচার দেখলে একটা কথা বুঝি—একেবারে হেরে গেছি।

আমি নিলোখেরির স্রষ্টিকর্তা। এখানে দুখীরামের পকেট থেকে সংগৃহীত সরকারী অর্থের যে বিরাট ব্যয় চলেছে তার জন্য সব দায়িত্ব একা আমার! তাই একলা চুপ করে অসহায় হ'য়ে বসে আর যা ঘটছে তা দেখা যায় না। কর্মমুখরিত হলাম আমি। ভিত থেকে শুরু করে জীবন পুনর্গঠনের একমাত্র ও সঙ্গীহীন প্রচেষ্টার এই নিলোখেরি সে বিষয় আর সন্দেহ নেই। একে নষ্ট হয়ে যেতে দেবো নাকি? কখনই না। অন্ততঃ এদেহে যতদিন জীবন আছে ততদিন তো নয়ই। তাই চরম পথের আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। আমার জানা, যে একটিমাত্র পথ আমার সামনে আজ খোলা, সেই পথেই পা বাড়ালাম শেষ পর্যন্ত। সে পথ মৌনতার পথ—একাকী বাসের পথ। যতদিন না জবাব খুঁজে পাই ততদিন এমনিই চালাবো।

"নিলোখেরির বন্ধু ও কমরেডদের কাছে আজ এই আমার নিবেদন যে তারা যেন আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করেন। ক্ষমা করেন আমাকে। আর আমার এই একাকীত্বের নির্জনতা ভঙ্গ না করেন। নতুন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যে রাজমজুর লাগবে, প্রার্থনা করি যে তার সন্ধানের জন্য যে যুদ্ধ প্রয়োজন, সেই যুদ্ধই যেন আমরা শুরু করে দিই। নিলোখেরির কাপ্তেন কে হবেন তাই নিয়ে লড়াই যে কতটুকু তা চোখ মেলে দেখাবার শক্তি যেন আমরা পাই। জাগ্রত বিবেকের উদ্ধার হোক এই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য।"

যখনই এমনিভাবে কিছু চেয়েছি উপনগরীর বাসিন্দারা দু'হাত তুলে উজাড় ক'রে আমায় ভরে দিয়েছেন। নিলোখেরিতে যতদিন ছিলাম তাঁবুতেই বাস করেছি। দু'মণ ওজনের দু'দিক খোলা তাঁবু। ইচ্ছামত ঢেকে

নেওয়া যায়। জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন বস্ত্র, পুস্তিকাদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র সবই তার মধ্যে থাকতো। নিলোখেরি উদ্বাস্তুতে ভরা। তাছাড়া চার পাশের অঞ্চল থেকে কত শত লোক রোজ আনাগোনা করছে। শহর থেকে দূরে একটা খালের ওপারে নিঃসঙ্গ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ছিল আমার বাস। প্রাহারার কোন বন্দোবস্তই ছিল না। কিন্তু একদিনের জন্য একটা তাম্রখণ্ডও আমার যথাস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। শরীরটাকে কাজের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে চেষ্টা করেছি। যে কাজ করছিলাম তার জন্য সরকারের কাছ থেকে একটি কাণাকড়িও আমি হাত পেতে নিতাম না। আমার পূর্বসঞ্চিত সংক্ষিপ্ত ধনাগার স্ত্রীর জিম্মা করে দিয়েছিলাম। তারই থেকে অতি অল্প মাসোহারা আমি আনিয়ে নিতাম। বাকী অর্থ দিয়ে আমার স্ত্রী আমার বাড়তি বয়সের ছেলে-মেয়েদের ও নিজের দেখাশুনা করতেন। স্ত্রীর ক্ষুদ্র সম্বল থেকে কম টাকা নিতে হবে অথচ শরীরটাকেও ঠিক রাখতে হবে তাই গত্যন্তর না দেখে খাওয়া কমাতে লাগলাম। দিনের মধ্যে একবার মাত্র খেতাম আর বাকী সময় লেবুর জল দিয়ে চালাতাম। কলোনীর ছুধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল। এছাড়া অফিসে বসে কঠিন পরিশ্রম সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাছাড়া রৌদ্রের খরতাপ আর শীতের নৃশংস দংশন রোধ করবার মত উপাচার কিছু ছিল না বললেই হয়। অবশেষে একদিন রুখে দাঁড়ালো ভীষণাকার জণ্ডিস রোগ। আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখলো। মনে আছে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে প্রায় ছুবছর লেগেছিল। তখন বুঝেছি যে যত বিশ্বাসী ভৃত্য আছে তাদের মধ্যে এই দেহ নামক বস্তুটা অন্যতম। তবু এরও তো কিছু চাহিদা আছে সেটা না মেটালে কঠিন বিপদ, আর সেটা এ শর্মারই।

আজ দশ বছর পরে নিলোখেরির ঘটনাগুলির দিকে যখন দেখি তখন নিঃসন্দেহে নিজেকে বলি যে মারাত্মক ভুল বলতে যা বুঝায় তা আমি একটাও করিনি। ভুলভ্রান্তি অনেক ঘটেছে। অপরিণত বুদ্ধি প্রসূত আদর্শবাদ আর যে কাজটা ক'রতে ব্রতী হ'য়েছিলাম সে কাজের অভিজ্ঞতা ঠিক মত না থাকার জন্য এই সব ভুলত্রুটি ঘটেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার ও আমার কাজের বহু রকম নিন্দাই আমার কানে এসেছে। কিন্তু আমার সততা ও

কর্ম সঙ্কল্প সম্বন্ধে কেউ কোনদিন সন্দিহান হ'য়েছে বলে শুনিনি। যা টাকা খরচ হয়েছে তাতে এ ধরনের সন্দেহ করা কিছু অসম্ভব ছিল না। সব চেয়ে গোলমেলে ব্যাপার তো ছিলই—সরকার থেকে দিন চালাবার জন্য একটা পয়সাও তো আমি নিতাম না। লোকটা খায় কি করে এপ্রশ্ন তো যে কেউ করে বসতে পারতো। কিন্তু আমার জ্ঞাতসারে এ প্রশ্ন করেছেন বলে মনে হয় না! কি এর কারণ? এ হ'লো এই দেশ ও দেশবাসীদের মহত্ত্ব। ব্যক্তিগত কুৎসা বা সততা সম্বন্ধে সন্দেহ এ দেশে সহজে করা যায় না। ভালমত ও সন্দেহাতীত কারণ পেলেই এসব কথা ওঠে।

১৯৪৯ সালে কাউণ্টেস এডুইনা মাউণ্টব্যাটনকে নিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী নিলোখেরিতে প্রথম পদার্পণ করেন সেদিন নিলোখেরিটা ছিল শুধু তাঁবুতে ভরা। একপাশে মিলিটারী ডিসপোজাল থেকে সংগৃহীত কারোগেটের শীটের ঢাকা দেওয়া একমাত্র ছাউনি ছিল আমার কর্মকেন্দ্রে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত পঁচাশীতম মাইল পোস্টের মুখোমুখী আমরা সেদিন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। সেইখানে উভয় পক্ষের নমস্কার বিনিময়ের পর গোটা দলটাকে আমাদের উপনগরীর নিজস্ব যানবাহনে উঠিয়ে নিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম আমাদের তাঁবু-ঘর অতিথি ভবনে। তারপর ঘড়ির কাঁটা ধ'রে আমরা অগ্রসর হ'য়েছি উপনগরীর ভিতর দিয়ে—তার বিভিন্ন কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য। কোথাও গোপন বা প্রকাশ্য কোন প্রতিবাদ হয়নি। তাঁর শুভ অভিযান কেউ কলঙ্কিত করে নি। একটা মালাও কেউ দেয়নি তাঁকে। বিদায় নেবার আগে একটি সাধারণ জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি উঠেছেন। একটি ছোট মেয়ে তাঁর কপালে তিলক লাগিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন "এ কি রকম নগর তোমার? এখানকার লোকজনেরাই বা কি রকম? আমি যেখানেই যাই চারিদিকে কত হৈ হৈ পড়ে যায়, অভিনন্দন জানায় আমাকে কত লোক, কত মালা পাই। ভারে নুয়ে পড়ি তবু দেয়। আর—এখানে—তোমাদের ব্যাপারটা কি? একটা শ্লোগান পর্যন্ত কেউ দিলো না। উপহার টুপহারও পেলাম না কিছুই।" আমার মুখের জবাব জোগাতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি—"আমরা জানতাম যে আগামীকালের ভারতবর্ষ গড়ার নয়া সড়কের সৃষ্টি হ'চ্ছে—একালে লোক কাজ ক'রে নিজের

ঘর বাঁধছে এইটুকু দেখতে আপনি এসেছেন। অন্য কতকগুলো ভার বোঝা নিয়ে আপনাকে তাই ক্লান্ত করেনি। সে দেবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষই তো আছে।" মৃদু হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। হো হো ক'রে হেসে ভেঙ্গে পড়লেন কাউন্টেস মাউণ্টব্যাটেন। গভর্ণর জেনারেলই হোন আর প্রধানমন্ত্রীই হোন নিলোখেরিতে এর আগে এবং পরে লোক চিরকালই এই রকম ভাবে সম্বর্ধিত হ'য়ে এসেছে, অন্ততঃ সেই নিলোখেরিকেই আমি চিনি।

## ॥ বৃহত্তর দিগন্তের প্রতীক ॥

১৯৫১ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত শ্রীচেস্টার বোলস এসে উপস্থিত হলেন। ভারতবর্ষে কোন একটি বিশেষ বুনিয়াদী পরিকল্পনা গঠনের জন্য আমেরিকান সরকার ৫০ মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হ'য়েছেন। তাঁর মারফত এসেছে সে প্রস্তাব। আলবার্ট মায়ার ও হোরাস-হোমস যে সুদক্ষ আমেরিকান সম্প্রসারণ ( extension ) কর্মী সে কথা আগেই বলেছি। তাঁদের গড়া এটোয়াতে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা তখন চার বছর হ'লো চালু হ'য়ে গেছে। চেস্টার বোলস যখন প্রধানমন্ত্রীকে আমেরিকার এই প্রস্তাবের কথা জানালেন আর তার সঙ্গে তিনি এটোয়া দেখে এসে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে সে প্রসঙ্গও উত্থাপন করলেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁকে বলা হ'লো। নিলোখেরিতে যে সাংগঠনিক কাজের প্রচেষ্টা চলেছে সেটাও দেখে আসতে বললেন। এর পরেই বোলস নিলোখেরি দেখে গেলেন। বোঝা গেল তিনি চমৎকৃত হয়েছেন। যদি পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার কাঠামো যে নিলোখেরি ও এটোয়ার যুগপৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হবে সে সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল না বলে মনে হ'লো। ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য আমাকে এই জাতীয় একটা পরিকল্পনা পেশ করার জন্য অনুরোধ জানানও হ'লো। নক্সা একটা তৈরি করে ফেললাম। শুধু নিলোখেরি আর এটোয়া নয়—ওয়ার্ধা, শ্রীনিকেতন, মার্তণ্ডম, বরোদা, গুরগাঁওর অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগও আমি নক্সা আঁকতে গ্রহণ করেছিলাম।

এবার সময় এলো আমার ভবিষ্যৎ কার্যসূচি নির্ধারণের। নিলোখেরিতেই থাকবো প্রেমের উপরে ভিত্তি করে। যে সমাজ গঠনের প্রয়াসে নিযুক্ত রয়েছি তাই করে যাব—না ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হব বৃহত্তর দিগন্তের দিকে। একটি দ্বীপের মত আলাদা হ'য়ে নিলোখেরি থাকবে, না এই উপমহাদেশের চতুর্দিকে সৃষ্টি হবে তার বহু সহযোগীর যাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সে বাঁচবে। বৃহত্তর দিগন্তে রয়েছে সেকাজের ভার। ততদিনে আমার খোলা মাঠের ক্যাম্প জীবনের পাঁচ বছর হ'য়ে গেছে। গ্রীষ্মের খরতা। খরতাপে

দগ্ধ হ'য়েছি প্রতি বছর। শীতের নৃশংস আক্রমণে আক্রান্ত হ'য়েছি এপাঁচ বছর। এক মুহূর্ত বিরতি না নিয়ে প্রতি বছর, আর প্রতি বছরের ৩৬৫ দিনের প্রতিটি দিন, আর দিনের প্রতিটি জাগরিত ঘণ্টা ধরে পড়েছে আমার হৃদয় নিঙড়ানো তপ্তরক্ত। নিলোখেরির মাটিতে অনেক মূলধন খাটানো হ'য়েছে আমার। একটা জলাজায়গা ভেঙ্গেচুরে আমার জীবন দিয়ে তৈরি করেছি এই নতুন সমাজ। একে ছেড়ে যাব স্থির করা বড় সহজ নয়। আলস্যভরে একবার লোভ হ'লো থেকে যাই, বাইরের জগতে যা হয় তাই হোক। শেষ পর্যন্ত কি করবো সেটা নির্ধারণ করতে সাহায্য ক'রলেন প্রধান-মন্ত্রী স্বয়ং। খুব উঁচু মাথাআলা বাড়ির স্থান গণতন্ত্রে নেই এই তাঁর বক্তব্য। "স্বীকার করছি যে তুমি থেকে গেলে নিলোখেরি আরও বড় হবে। কিন্তু তুমি যেদিন সরে যাবে সেই মুহূর্তে এই বিরাট সৌধ ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।" নিলোখেরি ছেড়ে চলে এলাম। এর পরে আরও এক বছর উঠতি কাজের পথে নিলোখেরি আমার কর্তৃতাধীনে ছিল। নিলোখেরি ও এটোয়া এই দুই পরিকল্পনার যুগল ভিত্তিতে রচিত যে সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি সেদিন বৃহত্তর দিগন্তের দিকে সম্প্রসারিত হ'য়েছিল তার পরিচালন কেন্দ্র হিসাবে সৃষ্টি হ'য়েছিল কমিউনিটি প্রজেক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের। এই সংস্থাটির অধীনে আরও এক বছর থাকবার পর পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের হাতে নিলোখেরি পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়। এখানকার অধিবাসিবৃন্দও প্রতিষ্ঠানগুলির যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণের আইনগত বন্দোবস্ত অবশ্য ঠিকমতই করা হ'য়েছিল! যেটুকু ও যে কটাদিন অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্বগুলি বহন না করলে নয় সেটুকু বহন করার ভার ভারত সরকার নিলেন। নিলোখেরি উপনগরীও সেখানকার ছোট্ট সমাজটি আজ পা বাড়ালো বৃহত্তর দিগন্তের দিকে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

নিলোখেরি ছেড়ে আসার একবছর পরে বর্ষাকালে ঐ অঞ্চলে একবার প্রবল ও অবিরাম বারিপাত হয়। বারো ঘণ্টা জল জমে ১২ ইঞ্চি। নিলোখেরি তো তৈরি হ'য়েছিল একটা জলা জায়গায়—স্থায়ী নালার কোন বন্দোবস্তই সেখানে তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এদিকে সেদিকে কিছুটা জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত ছিল। যে বৃষ্টি সেদিন পড়েছিল তাতে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন স্থায়ী শহরও চূর্ণ হ'য়ে যেত। পাঞ্জাবী ভাষায়

প্রকাশিত একটা নাম করা পত্রিকায় এই সময় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলো "দুঃসাহসী লোকদের মাথায় ওঠানোর ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জুড়ি নেই" এই হ'লো সম্পাদকের বক্তব্য। "আর একবার যাকে মাথায় তুলবেন তাকে আর নামাবার নাম ক'রবেন না—তার যত কারণই থাকুক না কেন।" এরপর আরও বক্তব্য ছিল। সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হ'য়েছে যে নিলোখেরির ভূতপূর্ব চৌধুরী'র (ক্যাপ্তেন) জবাবদিহি চাওয়া হোক। নিলোখেরিতে যে এত টাকা ঢালা হ'য়েছে তা গেল কোথায়—তিনি নাকি নিজের চোখে নিলোখেরি ঘুরে দেখে এসেছেন যে সেখানে বৃষ্টিতে সবই ধুয়ে মুছে গেছে! উপনগরীর চিহ্নটুকুও কোথাও নেই। সম্পাদকীয় পড়ে প্রধানমন্ত্রী একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমার দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। আর জানতে চেয়েছিলেন এ সম্বন্ধে আমার মতামত।

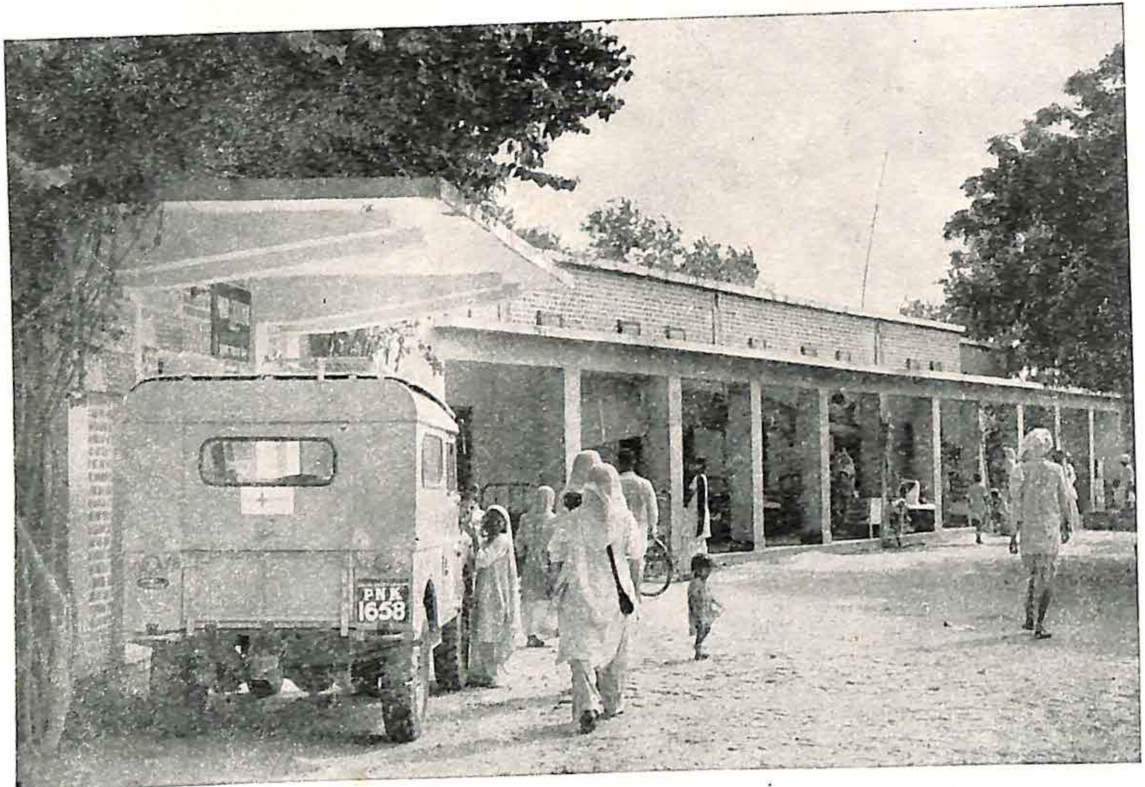
"নিলোখেরি প্রেম ও বিশ্বাসের উপরে রচিত হয়েছে। বন্যা হয়েছে বটে কিন্তু তাতে উপনগরীর কোন ক্ষতি হ'বে বলে মনে হয় না" জবাবে আমি জানালাম যে "এ সম্পাদক ভদ্রলোকের আমি বিশেষ কোন উপকার কখনও করেছি বলে মনে হয় না—তাই উনি হঠাৎ আমার পিছনে লেগেছেন কেন ঠিক বলতে পারছি না।" বন্যা ঠিকই হ'য়েছিল, কিন্তু বলাবাহুল্য উপনগরীর কোন ক্ষতি হয়নি।

পৃথিবীর কারোরই আজ নিলোখেরিতে প্রবেশে অসুবিধা নেই। বহুপথ এসে মিশেছে এমনি চৌমাথার কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে আছে নিলোখেরি। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের প্রমোশান প্রাপ্ত একজন তশীলদার আজ এখানে এ্যাডমিনি-স্ট্রেটিভ অফিসারের কাজে নিযুক্ত আছেন। পাঞ্জাব সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের সঙ্গে এখানকার শাসনযন্ত্রটা আজ একত্রীভূত হ'য়ে গেছে! এর অর্থনীতি আজ মুক্ত হ'য়ে গেছে দেশের বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে। সমাজ জীবনের যে মূল্যবোধ এখানে একদিন সৃষ্টি করা গিয়েছিল পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বহু ঘূর্ণিপাক সত্বেও তার অনেকাংশই এখনও অবশিষ্ট আছে। আর এইটুকু বাদ দিলে অন্য আর পাঁচটা জায়গা যেমন নিলোখেরিও আজ অনেকটা তেমনি। এই উপনগরীতে যে মূলধন খাটানো হ'য়েছিল এরা তার অনেকটাই ফিরিয়ে দিতে পেরেছে—বাকীটুকুও ধীরে ধীরে শোধ দেওয়া হ'চ্ছে। বাড়িগুলো ভালভাবেই কাজে লাগানো হ'য়েছে। সামূহিক বিকাশ

পরিকল্পনার কর্মীদের শিক্ষণের বন্দোবস্ত হ'য়েছে নিলোখেরিতে। আরও বেশ কয়েকটি টেকনিক্যাল ও শিক্ষা কেন্দ্রের স্থাপনা হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাস কুরুক্ষেত্র পত্রিকার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পণ্ডিত নেহেরু একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। তাতে যা বলেছেন তার কিছুটা নীচে তুলে দিলাম।

"ভারতবর্ষের সর্বত্র বহু সভ্যতাবিকাশের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রদীপের মত এদের আলো চারিদিকের অন্ধকারে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে। এই আলো আরও ছড়াতে হবে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে একদিন সমস্ত দেশকে আবৃত ক'রে ফেলবে। এই কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে নিলোখেরিও আছে। দেশে ও বিদেশে বেশ নাম করেছে এই নিলোখেরি। আর ঠিক সেইজন্যই এই কেন্দ্রটিও এর সমতুল্য অন্যান্য কেন্দ্রেরও দায়িত্বভার আজ বড় বেশি! কারণ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তো অন্যরা চলবেন। এদের উচ্চ মান রক্ষা করে চলতে হবে, কারণ আমরা ভাল কাজ চাই, শুধু বেশি কাজ নয়।"

ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই বৃহত্তর দিগন্তের দিকে পা বাড়িয়েছিল নিলোখেরি। ফাঁকা মাঠে নতুন উপনগরীর সৃষ্টি করা আজ আমাদের কর্তব্য নয়। মজদুর মঞ্জিল পরিকল্পনায় যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন গ্রামগুলি পুনর্গঠনের কথা ভাবা হ'চ্ছে। প্রথম চাই এই গ্রামগুলিতে সম্প্রসারিত মঙ্গল কর্মের বিকাশ আর ব্লকগুলির প্রধান কেন্দ্র স্থাপন। তারপর আস্তে আস্তে এই কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে পুনর্গঠনের কাঠামো। ৫২০০টি সামূহিক বিকাশ কেন্দ্রের সৃষ্টি হ'বে। যদি এরা সত্যি একদিন মাথা তুলে ওঠে, সে সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহই নেই আমাদের—তা হ'লে এক স্বয়ংক্রিয় অর্থনীতির সৃষ্টি ক'রবে এরাই। আগামী কালে সংখ্যায় এর চার ডবল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হবে। জীবনের এই গতির এই পরিণতিই আমাদের কাম্য। কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টই হ'লো সামূহিক বিকাশ। এর পূর্ব জাগরণের হাতিয়ার হ'লো পঞ্চায়েতীরাজ আর 'সহকারী সমাজ'! যে ত্রিমন্ত্রের কথা বলেছি তার হাতে কলমে প্রয়োগ—এই মাটির উপরে প্রয়োগ হ'লো সামূহিক বিকাশের মাধ্যমে। ১৯৫২ সাল থেকে এই পরিকল্পনা গড়ে তোলার যে বিশদ চেষ্টা হ'য়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করলাম।




উপনগরীর হাসপাতাল



এককালের জলাভূমিতে আজ শস্যের প্রাচুর্য

## পরিশিষ্ট

GOVT. TRAINING COLLEGE HOOGHLY Extension Services Dept.

# ॥ পঞ্চায়েতী রাজ্যের মাধ্যমে সামূহিক বিকাশ ॥

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চম বার্ষিক যোজনার কাজ শুরু হলো। অতীতের সম্মিলিত চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার উৎপত্তি হ'য়েছিল। তাই এর দৃষ্টি শহরের দিকেই প্রসারিত ছিল বেশি। সবার শেষে গ্রামের একটু স্থান ছিল হয়তো। বিভিন্নমুখী কর্ম পরিকল্পনার ও অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ ছিল। তবু ছোট একটু অঞ্চলে দীর্ঘদিন পরে হয়তো এসব পরিকল্পনা থেকে কিছু লাভ আসতো। অধিক খাদ্য ফলাও পরিকল্পনাটির আসল কাঠামোতেই গোলমাল ছিল। তেলা মাথায় তেল তো দেওয়াই হ'তো। তাছাড়া এও তখন পরিষ্কার হয়নি যে যেমন ভাবে শরীরের একটি প্রত্যঙ্গকে অন্য একটা অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রোগমুক্ত করা যায়না তেমনি জাতিনামক প্রাণীটিকে খাদ্য জোগাতে হ'লে যারা ফসল ফলাবে সেই সমগ্র জনসমাজকে একযোগে কর্মমুখর ক'রে তোলা দরকার। খাদ্য ফলাতে হ'লে শুধু কৃষি নয়, পশুপালন, সেচ, গ্রামীন শিল্প, সমবায়, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, তরুণ ও মহিলামঙ্গল অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা এ সকলেরই উন্নতি চাই। উন্নয়ন কাজের ফলকে যদি স্থায়িত্বলাভ করতে হয়, স্বীয় গতিতে ধাবমান করে তুলতে হয় এর গতিকে, তার মূল্যকে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে হয়—চারিদিক থেকে আক্রমণ চালাতে হবে একযোগে।

বহু শতাব্দী পরে যখন একটা দেশে জাগৃতি আসে তখন সরকার ও জনগণের মিলিত যে কর্মপ্রচেষ্টা তার মাঝে সরকারকেই যে বৃহত্তর দায়িত্বের ভার নিতে হয় সেবিষয়ে সন্দেহ থাকে না কোনও। অন্ততঃ প্রথমটা সরকারের দিকেই সাধারণ লোকেরা মুখ চেয়ে থাকবে, প্রথম ধাক্কাটা সেখান থেকেই আসবে এই আশায়। যখন বিদেশী শাসন চলছিল তখন এদেশের সরকার লণ্ডনে অবস্থিত হোয়াইট হল এবং দিল্লীর ভাইসরিগ্যাল লজ এরই হুকুমে ওঠবস করতেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রি থেকে এ ব্যবস্থার অবশ্য আমূল পরিবর্তন ঘটলো। হোয়াইট হল থেকে যে আদেশ আসতো

আজ তা আসবার কথা ভারতের জনতা থেকে। পুরাতন কর্তৃত্বের অবশেষ হ'য়েছে, ক্ষমতা বাঁটোয়ারা করে নিতে হবে। গণতন্ত্রের হাতে পড়েছে কর্তৃত্ব—তারও সঠিক বিকাশ তখনও সম্ভব হয়নি। আমাদের নতুন সংবিধান অনুযায়ী গ্রামপুনর্গঠনের সবকিছু সত্যিকারের দরকারী কাজগুলির দায়িত্ব পড়েছিল রাজ্যসরকারের উপর, কেন্দ্রীয় সরকার উপদেশ দিতে পারতেন মাত্র। রাজ্য সরকারেরও কাজ চলতো বিভিন্ন নির্বাচিত মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ বাঁটোয়ারা করে। তাদের পরস্পরের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একটা সম্যক যোগাযোগ স্থাপনা একদিনে সম্ভব হয়নি। নতুন গণতন্ত্রের ধীরে ধীরে হবে পত্তন ও শঙ্কার মধ্য দিয়ে এর অগ্রগতির যে প্রকাশ হবে সেইটাই স্বাভাবিক।

উত্তরাধিকার সূত্রে সেদিন আমরা যা পেয়েছিলাম তার মধ্যে প্রধান দ্রব্য দুটি—রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভিন্নমুখী ডিপার্টমেণ্টগুলি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দপ্তরটি বাদ দিলে এদের কাজ ছিল স্ফূর্তির বাণে গা ঢেলে দেওয়া। তার ঘূর্ণিপাক থেকে যেটুকু ছিঁটেফোঁটা সাধারণের গায়ে গিয়ে লাগতো সেটুকু বুদবুদ ছাড়া কিছুই নয়। এই রকম নাগরদোলায় ঘোরাই যদি উদ্দেশ্য হয় যোগাযোগের কথা সেখানে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু নতুন সরকারের সামনে সেদিন নতুন দায়িত্বের কথাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। লোক সেবা তখন তাদের নীতি। স্ফূর্তির বান, আর লোক সেবা পরস্পর বিরোধী। যাদের হাতে পাওয়ার হাউস চালানোর ভার সেই এঞ্জিনীয়াররাই যদি একে অন্যের বিপরীত দিকে অভিযান চালান তাহ'লে যে বন্যার কথা বলেছি তাতে শুধু খেলারই সৃষ্টি হয়, লাভ হয় এই যে সরকারী কাঠামোটাই বেড়ে ওঠে। শুধু দিল্লীতে নয় এমনিটি সেদিন ঘটেছিল সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতেই। ট্যাক্স বাড়ছে সমভাবে। কিন্তু কাগজকলমের অবদান আর নানাবিধ অত্যাচার ছাড়া লোকের পকেটে আর কিছুই পৌছায়নি।

নতুন পথের সন্ধান হ'য়েছে সেদিন। কে দেখাবে এই পথ। জনতার চাহিদাগুলি মেটাতে পারে এমনি একটি নতুন সংস্থার সৃষ্টি করতে হবে—না পুরোণো কলটাকেই নতুন আদর্শে পুনরুজ্জীবিত করলেই চলবে—এসব অনেক প্রশ্ন সেদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গ্রাম একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ। এর সমস্যা ও চাহিদা বিভিন্ন হ'লেও একাঙ্গীভূত। একে অন্যের সঙ্গে একসূত্রে

গ্রথিত। তাই সর্ব সমস্যাকে খর্ব ক'রতে হবে একযোগে। সাময়িক ভাবে কোন জোরালো সমস্যা সমাধানের জন্য বেশি উদগ্রীব হ'তে হলেও সর্বমুখী প্রচেষ্টার এই উপমহাদেশের সর্বত্র একটা নতুন সরকারী কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টার সূচনা করতে হলে বোধহয় দুটি সমান্তরাল সরকারের সৃষ্টি হয়ে যাবে। নতুন কেন্দ্র এইভাবে স্থাপিত হ'লে তার আয়ু অক্ষয় হবে না তা বলাই বাহুল্য। কারণ সরকারের পুরাতন যন্ত্রটা নতুনকেন্দ্রের গতির কাছে মাথা নত ক'রবে তা ভাবা ভুল। আর তাছাড়া যে অর্থ সুদক্ষ কর্মীদের প্রয়োজনে সে সম্পদই বা আসবে কোথা থেকে? সরকারী কর্মচারীরা দেশের বাছাই করা লোক, মজার বানে গা ঢেলে দিলেও এদের চেয়ে উন্নততর কর্মী পাচ্ছি কোথায়, বরঞ্চ একটা নতুন আহ্বান এদের সামনে তুলে ধরলে নতুনতর পরিচালনার সুযোগ দিলে মনে হয় নতুনরূপ পরিগ্রহ করার শক্তির পরিচয় এরা দিতে পারবে। পুরোনো যন্ত্রটাকে দিয়ে নতুন কাজ করতে হবে এই স্থির হ'লো। সামূহিক বিকাশ হলো এই নতুন কাজের তথ্য ও পন্থা। জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র হ'লো নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্থা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি এতদিন বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছিল আজ একত্রিত হ'লো তাদের পরিচালকমণ্ডলী। একযোগে কাজ করতে হবে তাদের। নতুন তীর্থ যাত্রার শুরু হলো ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে।

সরকারের নতুন কোন কাজে সহজে টাকা আসতে চায় না। কিন্তু যে কাজে আমরা হাত দিলাম তার আদর্শও যে ভাবে সরকারী কর্মচারীদের তাদের এতদিন ধরে লোকেরা শুধু ভয় করেই চলেছে জনতার কাছাকাছি টেনে আনা হ'লো—এসব মিলিয়ে যেন একটা যাদু খেলে গেল। দলেদলে লোক এগিয়ে আসতে লাগলো। তাদেখে আকাশের দেবতা থেকে আরম্ভ করে সবাই হতবাক! আমরা তো জ্যোতিষশাস্ত্র মানি, আলাদীনের প্রদীপেও বিশ্বাস করি। তবু আমাদের আশ্চর্যের সীমা ছিল না। শব্দহীন বিপ্লব দৈব ঘটনা আনন্দের আতিশয্যে কত নামকরণই না করা হ'লো। অনেক সমাজ-সেবার কাজ করে যারা এতদিন হাত পাকিয়েছে তারা ম্লান হ'য়ে গেলো, সরকারী যন্ত্রটা আহ্লাদে উথলে উঠলো। মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে পার্লামেণ্ট ও বিধানসভার সদস্যরা, খবরের কাগজয়ালারা আর বিদেশী ভ্রমণকারী বন্ধুরা কারুর কাছেই বাহবা পাবার কমতি ছিল না। তখন

কথা হ'লো যে দিকেদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে এই কার্যধারা। হয়তো ততটা অর্থ নেই যতটা বৃদ্ধিএর মঞ্জুরী হয়ে গেল। সরকারের টেকনিক্যাল বিভাগের লোকরা, কমিশনার থেকে আরম্ভ করে সাবডিভিশানাল অফিসাররা অবধি সকলেই প্রথম থেকে আমাদের এই নতুন কার্যধারা কেবল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার নিহিত শক্তির তাৎপর্য আস্তে আস্তে যখন সকলের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো তখন অলস পর্যবেক্ষণকারীদেরও উৎসাহ বেড়ে গেল। পার্লামেণ্ট ও বিধানসভার সদস্যদের তো বটেই।

প্রথম প্রথম প্রতিটি রাজ্যেই মাত্র কয়েকটা ক'রে কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছিল ১৯৫২ সালে। সকলের খরদৃষ্টি ছিল এদের প্রতি। এখানকার কর্মচারীদের বিশেষ ভাবে দক্ষ ক'রে তোলার জন্য শিক্ষণের বন্দোবস্ত করা আর ঊর্ধ্বতন থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম কেন্দ্রের কাজ দেখাশুনা করা সহজ ছিল। কিন্তু এর পরে যেমনি কাজ বাড়তে লাগলো কমিশনার থেকে আরম্ভ করে সাবডিভিশনাল অফিসাররা, টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের উঁচু থেকে নীচু সকলে, পার্লামেণ্ট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত মায় জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা সকলেই এই পরিকল্পনার কার্যধারার মধ্যে এসে পড়লেন তখন আগেকার শিক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ক দক্ষতা অনেকটাও হ্রাস পেল। কাজটাও খানিকটা নিয়ম ঘেঁষা, ছকে বাঁধা হ'য়ে গেল। হৃদয় বা মনের সামঞ্জস্য বিধান বা মনের দরদ দিয়ে যে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেদিকটায় খানিকটা ঘাটতি পড়লো। এদিকে আমাদের আদর্শ অনুযায়ীই গ্রামের লোকেরা সরকারী যন্ত্রটাকে অনেক সহজ ভাবে নিতে শুরু করে দিলেন। ভয় ভেঙ্গে গেছে তাদের—এতো আনন্দের কথা—এ-ই চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে নিত্য চাহিদার যে তালিকা তার বহর অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যেতে লাগলো।

গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বগুলি তখন শক্তিমানদের কুক্ষিগত। অর্থে বড় জাতিতে উঁচু বা চক্রান্ত কাজে পটু যারা নিচের অসার সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সেই মনিকাঞ্চন যোগ সাহায্য করেছে সরকার গ্রামে যা কিছু অর্থ ঢেলেছেন সেগুলির অধিকাংশই গুটি কতকের পকেটে ভ'রে দিতে। অগণিত জনতার ভাগে পড়েছে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সর্বসাধারণের উপভোগ্য বিষয়বস্তু থেকে সার গ্রহণের ভার। অর্থনৈতিক

সম্পদ যা এসেছে তার আয়তন এতই অল্প ছিল যে অল্প যারা সংখ্যায় তাদের জোগান দিতেই তাতে অনটন। এমন কি সমবায় সমিতিগুলির সৃষ্টি হয়েছিল শক্তিহীনদের শক্তি দেবার জন্য, সেগুলিও হ'য়ে গেল শক্তিশালীদের ক্ষমতা বাড়ানোর হাতিয়ার। এতদিন ধরে যে বিরাট প্রশংসার ধ্বনি উঠেছিল তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়লো আর শুরু হ'তে লাগলো নিন্দার ধ্বনি। যারা গ্রামে বসে বেশির ভাগ ঐশ্বর্য আহরণ করেছিল এমন কি তারাও এই নিন্দা ধ্বনির স্বরে স্বর মিলাতে দ্বিধা করে নি। এই ভাবেই বোধ হয় তারা স্বীয়বিবেককে বুঝিয়েছে। তাছাড়া যেটুকু হজম করেছিলো তাতে হজমী শক্তি ও ক্ষুধা ততদিনে হু হু ক'রে বেড়ে গেছে। সবচেয়ে মজার হলো কাগজগুলির স্বর। দীপ নিভেছে, ভুতে পাওয়া বৈদ্যকে এখন পোড়ান দরকার তাদের বক্তব্য অনেকটা এই পর্যায়ে এসে পড়েছিল।

ততদিনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই সামূহিক বিকাশ আন্দোলনে সরকারের বিরাট শাসনযন্ত্রের প্রায় সমস্তটাই জড়িয়ে পড়েছিল। সমাজের নীচু স্তর থেকে যে সেদিন আওয়াজ উঠেছিল তার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির জাতিগঠনমূলক মন্ত্রণালয়গুলি ভেঙ্গে গড়বার সাহায্য করেছিল। কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে কাগজের তাড়া সামলানোর চেয়ে সত্যিকারের কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। এমনি ভাবে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজক্ষেত্র, ফলের নার্শারী, পক্ষীপালন, মৎস্য উন্নয়ন, ফার্টিলাইজার, কম্পোজ ও সবুজসার ও অন্যান্য চাষীর উপযোগী পরিকল্পনার কাজে হাত লাগালেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, পানীয় জল সরবরাহ ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্যমূলক পরিকল্পনা ছাড়াও সহযোগী, মাতৃ ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র ও প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলের গঠনের কাজ মাথায় তুলে নিলেন। শিক্ষাদপ্তর গ্রন্থাগার গঠন, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ আর সমাজসেবার কাজ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। ব্লক সংস্থাকেই নতুন শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রভাবে গ্রহণ করে এই কাজটার বিকাশ হলো। ওয়ার্কস হাউসিং ও সরবরাহ মন্ত্রণালয় ও কমার্শ ও ইণ্ডাষ্ট্রিস মিনিষ্ট্রিও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। গ্রামীন গৃহ নির্মাণ ও গ্রামীন শিল্প বিস্তারের কাজে তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

অন্য মন্ত্রণালয়গুলিও এগিয়ে এলো। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর প্রতি ব্লকে ব্লকে শিশু শিল্পকলা, তরুণ ও বৃদ্ধদের নিয়ে সাংস্কৃতিক কাজের পরিকল্পনা গঠন করতে লাগলেন। গ্রামের লোককে গবেষণার ফল সম্বন্ধে সজাগ করা ও তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মোচন করার ভার তাদের উপর। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পাঁচশ পঞ্চাশ হাজার গ্রামে ন্যূনতম যা সম্পদ, উপভোগ্য বস্তুর প্রয়োজনে তা পৌঁছে দেওয়া। এই কাজে অন্যান্য মন্ত্রিদপ্তরগুলি সুদক্ষ জনবল যুগিয়ে আর দৈনন্দিন বিষয়বস্তুর চাহিদা ও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দিয়ে সাহায্য করলেন। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর ভার পড়লো দেশের অন্য একটি সম্পদ দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলা—সে হলো রাজ্য সরকারের রাজধানী থেকে আরম্ভ করে গ্রামে বসে যারা কাজ করবে সেই সব কর্মীদের নতুন আদর্শে দীক্ষিত করা ( Orientation ) ও তাদের কাজ করার জন্য পটু ক'রে তোলা ( training )। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ ইন কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট, ওরিয়েণ্টেশান এ্যাণ্ড স্টাডি সেণ্টার, সোশ্যাল এডুকেশান অরগানাইজার ও মুখ্য সেবিকাশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি এই কাজে লেগে গেল। প্রথোমক্ত সংস্থাটি হলো এই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির শীর্ষরূপী। এছাড়া সমবায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের গণতন্ত্রের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার শিক্ষা আর জনগণের পরিকল্পনা হাতেকলমে কি ক'রে ফুটিয়ে তোলা যায় তার কর্মধারায় সুদক্ষ করে তোলার জন্য আরও শিক্ষণ-কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা একটা সরকারী কার্যধারামাত্র ছিল। জনসাধারণের সাহায্যে সে এসেছে। আজ এমনি অবস্থায় এসে দাঁড়ানো গেল যে এই পরিকল্পনাকে যদি বাড়াতে হয়, গণতন্ত্রকে যদি সত্য করে তুলতে হয় তাহ'লে গণসংগঠনগুলিকে মহত্তর ক'রে তুলতে হ'বে। বাড়াতে হ'বে—তাদের শক্তি ও ক্ষমতা। কাজটা অবশ্য চলবে সরকারী সংগঠনের মাধ্যমে, কিন্তু তাদের দায়িত্ব হবে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির হুকুম তামিল করা। জনরাষ্ট্র মানে হ'ল মঙ্গলরাষ্ট্র। যে মঙ্গলরাষ্ট্র পরিকল্পনার ভার জনতার হাতে নেই সে রাষ্ট্র কখনই জনরাষ্ট্র হতে পারে না, এমন কি মঙ্গলকর্ম সেখানে স্থায়ীরূপ নিতে পারে না। এর নজির বার করতে হ'লে ইতিহাস

খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। আজকের পৃথিবী এর জলন্ত উদাহরণ। জনরাষ্ট্রে রাজ্যশাসনভার যদি জনসমাজ থেকে বহু দূরে অবস্থিত কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকে ও বহু পথ অতিবাহিত ক'রে আসতে হয়, তাহলে সে শাসনতন্ত্র এ জনরাষ্ট্রের উপযোগী নয়। আর একথাটা অনুন্নত অর্থনীতির আমাদের যে সব দেশের সম্বল, আর যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই তমসাচ্ছন্ন, তাদের মধ্যেই বেশি ক'রে প্রযোজ্য। যে গণতন্ত্রের সীমা পার্লামেণ্টে ও রাজ্যবিধানসভায় লুপ্ত হয়েছে—তার নীচে নামেনি, এই এতবড় উপমহাদেশে সে গণতন্ত্রের গতি হ্রাস পাবে। ভঙ্গুর হ'বে তার রূপ। সত্যিকারের গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ চাই তাই এই ধ্বনি সেদিন উঠেছিল।

এমনি করে জ্যামিতিক গতিতে সরকারী সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার চাহিদা বেড়ে উঠেছে। তাই আজ সময় এসেছে পরিষ্কার ভাবে ও আর একটুও সময় নষ্ট না করে কি ক'রতে হবে সে বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ওঠা। আমাদের সামনে অবশ্য পথ মাত্র দুটি। প্রথমটি হলো সরকারের শাসন-যন্ত্রটাকে টেনে বাড়িয়ে তোলা আর তার মানেই হলো প্রত্যেকটি গ্রামে প্রচুর সরকারী কর্মচারী নিয়োগ। বিভিন্নমুখী ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে তারা —কিন্তু এত লোক পোষার মত সম্পদ আমাদের দরিদ্র দেশের আছে কিনা তা ভেবে দেখার কথা। তাছাড়া এত কর্মচারী এলেই তাদের দেখাশুনা করার জন্য অত্যন্ত জটিল পরিচালনা সংস্থার সৃষ্টি ক'রতে হবে। এ রকম সংস্থা গড়ার মতন অভিজ্ঞতা আজ আমাদের নেই। তাছাড়া সেই সংস্থাকে যদি কাজে তৎপর ক'রে তুলতে হয় তাহ'লে তাকে সেই পুরোনো 'মাবাপ' সরকার ভয়ের উপরে যার ভিত্তি সেখানে ফিরে যেতে হবে। ভয়ের ভিত্তি করে কি গণতন্ত্র গড়তে পারে! হয়তো কোন দেশে এই রকম বহু সরকারী কর্মচারী আকীর্ণ গণতন্ত্র ও দূর পথবাহী শাসনব্যবস্থা মুখরোচক হ'তে পারে কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশে এই বিলাস চলবে না। এমনি গণতন্ত্র যে কোন না কোন রকমের একনায়কতন্ত্রের খপ্পরে গিয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। যেদিকেই যান না কেন সে গণতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য। এই সব পরস্পর বিরোধী শক্তির ভারে সরকারী শাসনযন্ত্রটা কেঁপেছে থরথর করে। কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মাটির কাছাকাছি অবস্থিত বহু কর্মচারী এমনি উভয় সঙ্কটে

পড়ে বারবার অপমানাহত হয়েছে। ভেবে দেখলে আশ্চর্য হই আজ তারাই এগিয়ে এলো নতুন পথ অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় মতের দিকে ঝাঁপ দেবার জন্য।

বহু মতের এই চৌমাথায় এসে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট আন্দোলন একটা নতুন পথ বেছে নিলো। সে পথের তথ্য হ'লো পঞ্চায়েতীরাজের তথ্য। পুরোণো পরিকল্পনা নতুন আদর্শে গড়ে তোলা। ১৯৫৯ এর ২রা অক্টোবর রাজস্থানে সম্পূর্ণশাসনযন্ত্রটার প্রথম আমূল পরিবর্তন হ'লো। ১লা নভেম্বর অন্ধ্র রাজ্যের স্থাপনা দিবসে অন্ধ্রদেশেও এই পরিবর্তন এসে গেল। স্থিতিশীল-ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি সেদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। রাজ্য বিধানসভার তলায় পঞ্চায়েত ছাড়া আর যতগুলি সংস্থা ছিল সবগুলিরও সেই দশা। ঠিক হ'লো ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি নামে যে নতুন আইন সম্মত ভাবে সৃষ্ট সংস্থাটি তার গঠন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে হবে। এছাড়া অবশ্য মহিলা ও অনুন্নত আর তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধিদের এই সংস্থাভুক্ত করারও সুযোগ ক'রে দেওয়া হ'লো। প্রত্যেক সমিতিতেই একজন প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট থাকবেন। ব্লকের সমস্ত কর্মচারীরা আর সরকারের বাজেট ও অন্যান্য সম্পদ সবই এই নতুন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হ'লো। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোগ্রাম তো বটেই তাছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সবকটিই এদের হাতে তুলে দেওয়া হ'লো। ব্লক পঞ্চায়েতগুলির সভাপতিবৃন্দ ও জেলার এম, পি ও এম, এল, এ-দের নিয়ে তৈরি প্রতিটি জেলায় এক একটি জেলা পরিষদ। জেলাশাসকও জেলাবস্থিত টেকনিক্যাল বিভাগের কর্মচারীদের সহযোগিতায় এই জেলাপরিষদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য করা ও উপদেশ দেওয়ার ভার গ্রহণ করলেন। এদের উপরে কর্তৃত্ব করার ভার অবশ্য তাঁদের দেওয়া হয়নি এই হলো নতুন সংবিধান। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাষ্ট্রে, প্রতি পলে এই সংবিধানকে কার্যকরী করে তোলার তপস্যা চলেছে।

রাজ্য বিধানসভার যাত্রা এই ভাবে শুরু। রাজধানী থেকে জেলা সংগঠনের মাধ্যমে আর ব্লক সংস্থা পার হয়ে তার হাতে পৌছাবে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে। রাজ্য সরকার অনুমোদিত কার্যধারার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করা ও তাকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব বর্তাবে এই নতুন সংস্থাগুলির

উপর। জনগণের সংগঠন এরা। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌমত্বের দিন বুঝি শেষ হলো। গণতান্ত্রিক জনসংগঠনগুলির হাতে আজ যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হবে। শীর্ষ থেকে আভূমি বিস্তারিত এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থাগুলির কর্তৃত্বও সাহায্য মেনে নিতে হবে তাদের। পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েতের পথে এই হলো গণতন্ত্রের অভিযান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্টের শুভ মধ্যরাত্রে আমাদের সেরা নেতৃত্বের হাতে যে ক্ষমতা এসে পড়েছিল সেই শক্তি এতদিনে পেলো জনতার সন্ধান। কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা খিদে আছে। মানুষের কণ্ঠরোধ না করে এই খিদে মেটাতে হবে। আর একমাত্র তা হলেই স্বাধীনতার পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করতে পারবে এই গণতন্ত্র। তাই আজকের ধ্বনি হলো মানুষ চাই।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ হলো জনতার হাতে যে ঐশ্বর্য আছে তারই সম্প্রসারিতরূপ। জনসাধারণের চাহিদা তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানদের সরবরাহ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার জন্য খিদে মিটানোর মত আমাদের যোগ্য নেতৃত্ব ও সম্পদের আজ একান্ত অভাব। আমাদের সর্বসামর্থ্যকে মথিত করে, এর এ চাহিদা ও খিদে দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতীরাজের প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে অনেক কিছুই করতে পারেন। চারি দিক বুঝে পরিকল্পনা করা, জনবল সংগ্রহ করা ও শাসনযন্ত্রটা চালানো সবই তাঁরা পারেন, শুধু পারেন না গ্রামের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পাদন করা। তাই এরই পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে হয় আজ একই সূত্রে গাঁথা সমবায় সমিতিকে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বোঝা সেই সামলে নেবে। মাতৃস্বরূপা অর্থনৈতিক সংস্থা রূপে গ্রামে তাই স্থাপিত হলো সমবায় প্রতিষ্ঠান। এই যুক্ত সমবায়গুলি সম্পদ আহরণ করবে বিরাটতর সর্ব-ভারতীয় কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ( functional institution )। তাছাড়া বিভিন্ন কাজে দক্ষ ও উর্ধ্বতন লোকের সঙ্গে আরও অনেক সমবায় সংস্থার এমনি ভাবেই সংযুক্ত থাকা উচিত। তবু শুধু সমবায় ও পঞ্চায়েতী গ্রামের ক্রমবর্ধমান বিরাট চাহিদার সমাধান করতে পারে না। তাই এদের অসমাপ্ত কাজের জোগান দেবার জন্য চাই বেসরকারী আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। যুবক মণ্ডল, বাল মণ্ডল, মহিলা মণ্ডল, দস্তকার মণ্ডল আরও এই রকম বহু প্রতিষ্ঠান গ্রামীন জীবনের বিস্তারের সংগে সংগে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এদের

নামকরণ করা যাক এ্যাসোসিয়েটড অর্গানিজেশান। পঞ্চায়েতীরাজ হলো আইন কর্তৃক স্থাপিত সংস্থা। এর তরফের এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রাবস্থিত গ্রামীন পরিকল্পনাগুলির সমাধান করে চলবে। গ্রামীন ব্লকস্থিত ও জেলার বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের কো-অপ্ট করে নেওয়া চলবে। দৈর্ঘ্য ও গভীরতায় ও প্রস্থে এমনি করে দীর্ঘায়ত হবে এই উপসংস্থাগুলির সংঘশক্তি। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা ও শাসনতান্ত্রিক কাজে বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁরাই এতদিন কাজ চালাচ্ছিলেন। জন জীবনের নিহিত কর্মদক্ষতা আজ সেই কাজের শক্তি বাড়াবে। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কুকাজ সামলাবার অনেক দায়িত্বই এরা নিতে পারবে। আবার এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে এসে এদেরও উপকার হবে বলেই মনে হয়।

শুধু জনসংখ্যা মানেই জন সম্পদ নয়। এ আমরা বারবার ঠেকে শিখেছি। জনসংগঠন—প্রতিনিধিত্বমূলকই হোক আর উপসংস্থাই হোক এরা সব সময়ে ভাল নাও হতে পারে। কখনও কখনও জন সাধারণের ট্যাক্সে-এর বোঝা বাড়িয়ে এরা জনদুঃখেরও কারণ হয়। তাই সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ দক্ষতায় সমাজকে পরিপক্ক করে তোলার জন্য বহু শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। শীর্ষ থেকে আভূমি বিস্তারিত সরকারী কর্মচারীদের দক্ষ করার জন্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরই আজ জনপ্রতিনিধি ও জনসংযোগীদের শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার সংগে সংগে সাধারণ জনতার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত চাই। অজ্ঞ জনসাধারণ ও শিক্ষিত প্রতিনিধির ব্যবধান অলীক অথবা দুস্তর বা অসম শক্তিশালী শাসনযন্ত্র আর নিরীহ জনসমাজ এই দুইয়ের মিশ্রণে শয়তান মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ক্ষমতা কাউকে দেওয়া যায় না, ক্ষমতা নিতে হয়। তাই ক্ষমতা উত্তরাধিকারের দলিল যাদের হাতে তাদের দক্ষ করে তুলতে হবে শিক্ষা দিয়ে, নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে। এই রকম একটা শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু শুধু উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। একলা সরকারও এ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন তা ভাবাও ভুল। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানও ও প্রতিটি দলকে শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তীতার ক্ষেত্রে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই কাজ সফল করার জন্য আমাদের পার্লামেন্টের সদস্য থেকে আরম্ভ করে রাজ্য বিধান সদস্যরাও বেসরকারী সমাজে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আজ আরও

অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যেমন পঞ্চায়েত আর সমবায় ঠিক তেমনি আমাদের তৃতীয় নম্বরের বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামের বিদ্যালয়টি। এর উপরে দায়িত্ব বড় কম নয়। সমাজের ছোট থেকে বড় সকলের সমাজকেন্দ্র হোক এই বিদ্যালয়। তেমনি এই বিদ্যালয়ই হবে সকল শিশুর নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠন ও শিক্ষাদানের ভিত্তিভূমি।

আজ আমাদের সমাজে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয় কোন কোন রাজ্যে একই দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও বিরোধ লেগেই আছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করবার জন্য গঠনমূলক কাজের যথেষ্ট বন্দোবস্ত সকলের সামনে তুলে না ধরলে এদ্বন্দ্ব বেড়েই যাবে আর কত লোকের শ্রমশক্তি পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে তার ঠিক নেই! অনেকেই কিন্তু এই সমস্যাটার একটা অতি সরল সমাধানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁরা বলেন কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সর্বদলীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা দরকার। জাতির কোন বিশেষ সংকট কালে এরকম সর্বদলীয় সরকারের কথা ভাবা যেতে পারে আর তখনই এসব কথা উঠতে পারে। কিন্তু তবু বিরোধীদলগুলি যদি শুধু নেতিবাচক কাজ করে যেতে থাকে—সমালোচনা করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার সুযোগই না দেওয়া হয় তাহলে তাদের পুঞ্জীভূত রুদ্ধ আক্রোশটাকে অযৌক্তিক বলতে পারি না। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থাটি ভেঙ্গে দেওয়ার পর এই ধরনের পরিস্থিতিটি যেন আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। কেন্দ্রীয় সরকার যে দলের হাতে সে দল ছাড়াও অন্য দলগুলি যে রাজ্য সরকার পরিচালনা করতে পারে সে জানি। কিন্তু ইহা গণতন্ত্রকে অধিক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জেলা পরিষদ, ব্লক সমিতি ও পঞ্চায়েতগুলির বর্তমান কার্যসূচি বিচার করলেই ইহা বোঝা যাবে। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করলে বিভিন্ন দলের লোকেরা এমন কি নির্দলীয় যারা তারাও আজ শাসন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এরূপে নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজ সব রাজনৈতিক দলগুলিকেই সমভাবে তাই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। গঠনমূলক ভাবে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ আজ অবাধ। ভোটদাতারা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে জনগণ সম্পর্কে বর্তমান কাজকর্মের মধ্যে দলগুলোকে বিচার করার সুযোগও পায়। এর ফলে এই সুবিধে হয় যে

দলগুলোর অতীত কাজের ইতিহাস, বর্তমান গালিগালজ, আর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয় না। আরও একটা সম্ভাবনা আছে। যখন একেবারে নীচের তলায় যেখানে মানুষের মূল চাহিদাগুলি মেটে ঠিক সেইখানে শাসনতন্ত্রের সার্থকতা দেখা যাবে। তখন হয়তো বিভিন্ন দলগত মতভেদের সুযোগই থাকবে না—একটা দল নিরপেক্ষ শাসন মত ও সংস্থার সৃষ্টি হতে পারবে। তাই বলতে চাই যে মাটির কাছাকাছি যে কাজগুলি ঘটবে অন্ততঃ সেইখানে বিভিন্ন দলের গ্রন্থিগুলি হয়তো নিজের থেকে শিথিল হয়ে আসবে। কাজে দক্ষ, সততাবোধে উদ্বুদ্ধ নেতা যাঁরা লোকের ভালবাসা অর্জন করবেন সেদিন তাঁদেরই খোঁজ প'ড়বে। আর নীচের তলায় যদি এমনি বিবর্তন ঘটে উর্ধ্বলোকেও তার ছাপ পড়বেই—আর তাতে সমগ্র জাতির উপকারই হবে।

এইবার শেষ দৃশ্যটা যেন পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তিতে রচিত হবে ভারতীয় জনতার স্বরাজ্য। পথ নির্ধারিত হবে মতনির্ধারণের দ্বারা —শুধু ভোট দ্বন্দ্বে নয়। প্রত্যেকটি সংস্থাতেই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি উন্নয়নের জন্য কতকগুলি উপসমিতি থাকবে। উপসংস্থাগুলির সদস্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনগুলির সদস্যদের নিয়ে এই কার্যকরী উপসমিতিগুলি গঠিত হবে। গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি আর এই উপসংস্থাগুলি ও তাদের উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলি যুগ্মভাবে বিভিন্ন দিকব্যাপী জীবন উন্নয়নের কাজ মাথায় তুলে নেবেন। প্রতিটি উপসমিতিতে কিছু না কিছু লোক থাকবে। এ রকম ভাবে প্রতিটি ও সবকটির মাধ্যমে সর্বজন কর্মমথিত হয়ে উঠবে। সরকারের স্থায়ী শাসনযন্ত্রটার উপর ভার পড়বে জনগণের প্রতিনিধিদের নির্ধারিত পন্থায় তাদের সেবা যোগাবার প্রতিনিধি ও প্রতিযোগী দুয়ে মিলে একে অন্যের সহযোগিতায় কাজ করবে। একে অন্যের যা কিছু মন্দ কণ্ঠরোধ করে বন্ধ করতে পারবে। কেন্দ্রাবস্থিত লোকসভার গ্রামাবস্থিত প্রতিচ্ছবি হলো গ্রামসভা। গ্রামের সব বয়স্ক লোকের সংস্থা এটি। গ্রামে যা কিছু কাজ হবে তার অনুমোদন আগে গ্রামসভা থেকে নিয়ে নিতে হবে আর এই সংস্থার সহযোগিতায় কার্য সমাপন হবে। পরিকল্পনা গঠন করা ও তাকে কাজে লাগানোর বিশেষ দায়িত্বভার পরের গ্রাম ব্লক ও জেলার উপর। এদের

কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা রচিত ও বিকশিত হবে। রাজনৈতিক নেতাদের ও সরকারী কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ হুহু করে কমে যাবে। হয়ত বা লুপ্ত হবে একেবারে। সর্বসাধারণের সতর্কতা সর্বস্তরে ব্যাপকতা লাভ ক'রবে। সরকারী কর্মী বা প্রতিনিধিরা কেউই আর আলাদা হ'য়ে থাকবে না। নির্জনে যে ব্যক্তিটা অপরাধ ঘটায় আজ মিলিত শক্তিতে তার সেই অপরাধ রোধ হবে।

গ্রামকে আজ একটা সম্পূর্ণ সমাজরূপে দেখাটাই সবচেয়ে বড় কথা। আজকে গ্রামের সচল অঙ্গগুলি নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চারিদিকের পরিখাস্থিত শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণে খণ্ড-বিখণ্ড প্রায়। নতুন শাসনতন্ত্র আর তার বিরাট শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতার পরিকল্পনা যোগাবে জাগরণ। যারা ধনী শক্তিবান তারা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে যখন যে অশক্ত তার সেবার কাজে এগিয়ে আসবে—তাদের অভিভাবকত্বে ধন্য হবে। দেশের বিভিন্ন গ্রামগুলির সংযুক্ত রাষ্ট্র হবে নতুন ভারতবর্ষ এই ছিল বাপুর স্বপ্ন আর বিভিন্ন পরিবারগুলি মিলে বৃহত্তর পরিবারের রূপ পাবে গ্রাম। নিজের দৈনন্দিন চাহিদা অনেকাংশই সে নিজেই প্রস্তুত করে নেবে। জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে গ্রামগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করবে। মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের খাদ্য, তাদের বস্ত্রাদি সংগ্রহ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, খেলাধুলা, গানবাজনা, যাত্রাদি, আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা আর গ্রামীন প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম পরিবারবাসী দুর্জনের সংশোধনের দায়িত্ব গ্রাম সমাজের দ্বারাই সাধিত হবে। জীবন লীলার কাজে যার যার পূর্ণ কর্তৃত্ব করার ভার তার তার নিজের হাতেই থাকবে।

বাদশাহী ও পঞ্চায়েত রাজের সহাবস্থান সম্ভব নয়, দুটোর মধ্যে একটাই বাঁচবে। বিদেশী বংশোদ্ভুত শাহীবাদী আমাদের দেশে জেঁকে বসেছিল। তার কারণ সেদিন সমস্ত দেশটাকে পেয়ে বসেছিল এক বিরাট শূন্যতা। দেশী ক্ষুদে সাহেবরা হাত মেলাতে রাজী হ'য়েছিল এই বিজাতীয় পাপের সঙ্গে। তাই আজ বিদেশী শক্তিটা গেছে কিন্তু দেশী বিষটার ঘনত্ব কমেনি। ভারত সরকার হয়তো নিজের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু ইতিহাসের ভূত আজও বোরখার আড়ালে দাঁড়িয়ে। শকুনের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে তার চোখ। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সাড়ে পাঁচশো দেশীয় রাজ্য অন্তর্হিত হয়েছে।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রবাদ যাওয়া আর এক সামন্ততান্ত্রিক স্পৃহাটাকে দমন করা অন্য ব্যাপার। রাজা রাজড়ারা, জায়গীরদার, আর জমিদাররা দেওয়ালের রক্ত-রেখা দেখে নতুন যুগের কাছে মাথা অবনমিত করতে পেরেছে বটে কিন্তু তাদের ছেড়ে দেওয়া ভুতুড়ে ছায়াটার সেই বোধশক্তি নেই বললেই চলে। সেই অতীতে ফিরে যাবার টান এখনও অনেকেরই আছে। কখনও বা গুপ্তভাবে, কখনও বা প্রকাশ্য নির্লজভাবে সেইমুখ বেরিয়ে পড়েছে। রোগটা অতি পুরাতন কিনা তাই।

কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টই হলো সেই সর্বোদয়। সে যে ধরনেরই হোক যারা সমাজবাদ বিশ্বাস করে তাদের সকলেরই সামনে আজ এই একটা পথই খোলা আছে। অতীতের যৌথ পরিবার ছিল ভারতীয় সমাজের জাগ্রত রূপ। সেই যৌথ পরিবারের সম্প্রসারিতরূপ হলো কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট। বিরাট তার বিস্তৃতি—গ্রাম ছাড়িয়ে ব্লক, জেলা আর রাজ্য পার হ'য়ে সমস্ত জাতির সঙ্গে মিলে ব্যাপকতা পেল তার রূপ। সামূহিক বিকাশই হ'ল লক্ষ্য—পঞ্চায়েতরাজটা হোল সেই লক্ষ্যে পৌছাবার পথ—সামূহিক বিকাশ লাভ ক'রতে হলে কিন্তু পঞ্চায়েতরাজকে কতগুলি অগ্নি পরীক্ষায় পার হতে হবে। এই বিভিন্নমুখী পরীক্ষাগুলির কিছুটা আভাস নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। কৃষির ফসল বাড়াতে হবে সমস্ত জাতির কথা মনে করে—আজ এই কাজটাই সবচেয়ে জোরে ও সবার আগে করতে হবে।

২। গ্রামীন শিল্পের উন্নতি করা চাই।

৩। সমবায়ী সংগঠনগুলি গ'ড়তে হবে।

৪। স্থানীয় সম্পদ মায় জনসম্পদ পর্যন্ত—তার বিকাশ চাই।

৫। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে যে অর্থ, বল, কর্মীবল ও টেকনিক্যাল সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা নানান জায়গা থেকে এসে পড়বে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার চাই।

৬। আর্থিক সঙ্গতিহীন লোকদের সবরকম সাহায্য করতে হবে।

৭। স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বিশেষ ঝোঁক দিয়ে, কর্তৃত্ব ও কর্মোৎসাহ ওপর থেকে নিচে আর সারিবন্দীভাবেও ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে।

৮। জনতার প্রতিনিধি ও জনগণের সেবকদের মধ্যে পূর্ণ সদ্ভাব ও আদান-প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। কে কি কাজ ক'রবে তারও একটা পরিষ্কার ভাগ হওয়া দরকার! দুই দলকেই সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ দক্ষতা লাভ করতে হবে।

৯। সরকারী ও বেসরকারী এই দুইদল কর্মীর মধ্যে কর্ম ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

১০। সমাজে সামঞ্জস্য আসবে, সমবায়িক আত্মনির্ভরতা বাড়বে।

কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টটা আলাদীনের প্রদীপ নয়। সমস্ত শাসন-যন্ত্রটাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান জুড়ে বসবে গণতন্ত্রে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট এর কাজ বড় জোর হলো সর্বজনতার সপক্ষে ওকালতী করা। শিশুমাত্র সে আজ। আর এই যদি তার রূপ হয় কেমন করে বাড়বে সে? বাঁচবে কি? বাঁচবে। অন্ততঃ ইতিহাস তো তাই বলে। মানুষের সন্ধানে বেরিয়েছি আমরা। সেই যাত্রাপথের বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হ'লে সে দ্বন্দ্বগুলির সঠিক স্বরূপ সকলের কাছে উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। গণতন্ত্রে অন্য সকলকে জোর করে হিংসার দ্বারা আমার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যায় না। 'বহু' রূপী বিরাট দৈত্যটার ঘাড়ে 'ক্ষুদ্র' রূপী স্বল্পসংখ্যক যারা উঠে বসে চাবুক তুলেছেন স্ফূর্তির পথে এগোবার জন্যে তাদের আজ নামতে হবে। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ধাপ্পাবাজী ক'রতে হবে বন্ধ। কারুর গোটা মাথাটা কেটে নেওয়ার দিন আজ শেষ হ'য়ে এলো। জনসাধারণের মতামতকে তাই উজ্জ্বল করে তুলতে হবে আজ জ্ঞানবর্তিকার স্পর্শে। সমাজবাদী কাঠামো চাই অথচ যুক্তি তর্কের ধার ধারবো না এইটে সত্যাসত্যের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু কে দেখাবে সে পথ? কে ক'রবে জন জাগরণের বিকাশ? সমাজ উন্নয়নের অগ্রগতির পথে দেশের কোন্ কোন্ শক্তি সমর্থন জানাবে? স্থানীয় শক্তির চাপে যখন সে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে সমবেদনা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কে তাকে তুলে ধরবে?

পাথর, সিমেণ্ট, চুন সুরকী আর সেই সংগে নৈপুণ্য ও সংগঠন থাকলে রাতারাতিই বিরাট একটা সৌধ গড়ে তোলা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে শত চেষ্টা করেও একটি গাছে একটি পাতা গজান যায় না। ভারতের জনগণ আজও সম্পূর্ণ সজীব একটি প্রাণকেন্দ্র—জটিল হ'লেও বহু শতাব্দীর

নানা বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সে টিকে আছে। অতি দ্রুতগতিতে তাকে চালাতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতীতে আমরা যারা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আগামীকালের পৃথিবীতে চলবার জন্য তাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। সমস্ত দিনটা যেন সম্মোহিত হয়ে সে কাটিয়েছে। বাড় যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে ভবিষ্যতে খাপ খাওয়াবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সততা থাকলে আর এই সততার পিছনে শ্রদ্ধা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলে গতি তার দ্রুততর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু তীর্থযাত্রার এই তো মাত্র শুরু। বহু পথ সম্মুখে। দীর্ঘায়িত সে পথ। চলেছি কিন্তু ঠিক দিকেই। পিছনের আর সামনের আকর্ষণ, এই দুয়ের নির্দেশে সীমিত হবে তার যাত্রার গতি। শয়তানটা তবু বারবার খোঁচা দিচ্ছে—পথভ্রষ্ট করাতে চায়—নামাতে চায় রাজপথ ছেড়ে অন্ধগলিতে।

---

* সামূহিক বিকাশের পূর্ণবিবরণ লেখক নিম্নোক্ত পুস্তকদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠকের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করছি। ১। সামূহিক বিকাশ—প্রকাশক থ্যাকার স্পিঙ্ক এ্যাণ্ড কোং। ২। পঞ্চায়েতী রাজ—প্রকাশক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা।

# পরিশিষ্ট

## প্রতিষ্ঠান তালিকা—নিলোখেরি

### সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা ( নিলোখেরি ১৯৬১ )

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত

১। এক্সেটেনশান এডুকেশান ইন্‌স্টিটিউট, নিলোখেরি
২। ওরিয়েণ্টেশান ও স্টাডি সেণ্টার, নিলোখেরি
৩। সমাজশিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র, নিলোখেরি
৪। খাদি গ্রামোদ্যোগ বিদ্যালয়, নিলোখেরি
৫। বিজ্ঞান মন্দির

পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক পরিচালিত

১। পাঞ্জাব পলিটেকনিক, নিলোখেরি
২। সরকারী উচ্চ সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়, নিলোখেরি

সরকারী অফিস

১। সহকারী জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তর
২। এস, ডি, ও ( পি, ডব্লিউ, ডি, বিল্ডিং ও রোডস )
৩। ফরেস্ট রেঞ্জার
৪। পশুচিকিৎসালয়
৫। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৬। ব্লক উন্নয়ন অধিকারীর অফিস
৭। সেচ সংক্রান্ত জেলাদার
৮। জনস্বাস্থ্য পি, ডব্লিউ, ডি'র সেকশান অফিসারের দপ্তর
৯। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি
১০। পাঞ্জাব প্রাদেশিক ইলেকট্রিক বোর্ড

# শিল্প ও হস্ত শিল্প

## নিলোখেরির শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্র সমূহের তালিকা

**১৯৫২**

১। ছাপাখানা
২। ট্যানারী
৩। ছুতোরশালা
৪। মেটাল ওয়ার্কসপ
৫। বৈদ্যুতিক ও জল সরবরাহ কেন্দ্র
৬। উইভিং ও ডায়িং
৭। চর্মশিল্প
৮। সাবান তৈরির কেন্দ্র
৯। রাসায়নিক শিল্প
১০। ট্রাঙ্ক তৈয়ারি
১১। হোসিয়ারী ( তুইটি )
১২। যানবাহন ও মোটর রিপেয়ার
১৩। তৈরির কাপড় কেন্দ্র
১৪। কামারশালা
১৫। কাঁচতৈরি কেন্দ্র
১৬। জাল বুননী
১৭। পাউরুটি তৈরি
১৮। ঘানির তেল ( কলু )
১৯। লণ্ড্রী
২০। দর্জি শিল্প
২১। স্টীল ফেব্রিকেশান
২২। ক্যালিকো প্রিন্টিং
২৩। স্থতোর বল তৈরি
২৪। কৃষি
২৫। ডেয়ারী

**১৯৬১**

১। ছাপাখানা
২। সরকারী এঞ্জিনীয়ারীং
৩। শীট মেটাল ওয়ার্কসপ
৪। তাঁত
৫। হোসিয়ারী
৬। ট্রান্সপোর্ট ও অটোমবিল ওয়ার্কসপ
৭। তৈল কেন্দ্র
৮। ধাতব দ্রব্য প্রস্তুত কেন্দ্র ( এনামেলিং, গ্যালভানাইজিং প্লেটিং ও পালিশের কাজ )
৯। জুতার কারখানা
১০। লণ্ড্রি
১১। কৃষি
১২। ডেয়ারী
১৩। বই বাঁধাই
১৪। ঘড়ি ও হাতঘড়ি মেরামত
১৫। জি, আই, পাইপ ও লোহার জাল তৈরির কেন্দ্র
১৬। দ্বি ও ত্রিচক্র সাইকেল মেরামত কেন্দ্র
১৭। স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্য প্রস্তুত কেন্দ্র
১৮। কাঠের কারখানা
১৯। ময়দার কারখানা
২০। হাড়ের কারখানা

২১। চালের কল
২২। ইটের পাজা
২৩। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা
২৪। হাসপাতালের আসবাবপত্র তৈরির কারখানা
২৫। প্ল্যাষ্টিক কেন তৈরির কেন্দ্র
২৬। পোলট্রি
২৭। শূকর চাষ
২৮। মেষ চাষ
২৯। ফার্টালাইজার তৈরি কেন্দ্র

# জনসংখ্যার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য—১৯৬১

১৯৬১র সেন্সাসে পাওয়া যায় নিলোখেরির জনসংখ্যা ৮০৪২ ( পুরুষ সংখ্যা ৪৬২৭ স্ত্রীসংখ্যা ৩৪১৫ ) ১৯৫১ সালের সেন্সাসে নিলোখেরির জনসংখ্যা ৬২৮৭ ( পুরুষ সংখ্যা ৩৮০১ স্ত্রীসংখ্যা ২৪৮৬ ) বিগত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৮% ( ২১·৭% বেড়েছে পুরুষ জনসংখ্যা আর ৩৭·৪% বেড়েছে স্ত্রী জনসংখ্যা )। স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়েছে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এতে করে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে সংখ্যা গরিষ্ঠতার পার্থক্য ছিল সেটা অনেকটা কমেছে। ১৯৫১ সালের প্রতি ১০০ পুরুষে স্ত্রীসংখ্যা ছিল ৬৫। ১৯৬১তে সেখানে স্ত্রীসংখ্যা হলো ৭৪।

## বাড়ি ও গৃহস্থালী

উপনগরীতে ১২৫৯টি বাড়ি ও ১৬১৭টি গৃহস্থালী আছে। পোড়া ইটে বাড়িগুলি তৈরি ছাদও সিমেণ্টে গড়া। শতকরা ৬৫টি বাড়ি যারা বাস করছেন তাদের মালিকানাধীন। অন্যাংশ ৩৫% বাড়ির বাসিন্দারা হ'লেন ভাড়াটে।

## গৃহাবস্থা

শতকরা ৩৪টি গৃহস্থালীর লোকেরা একঘর বিশিষ্ট গৃহে বাস করে। ঘর প্রতি লোক ঘনতা হলো ৩·৮ শতকরা ৩২ জন বাস করেন দ্বিকক্ষশালী গৃহে। ঘন প্রতি লোক ঘনতা হলো ২·৮। শতকরা ২০ জন তিনঘর বিশিষ্ট গৃহে বাস করে লোক ঘনতা ২। শতকরা ১১টি গৃহস্থালী ৪ ঘর আলা বাড়িতে বাস করে লোক ঘনতা ১·৭। নিলোখেরির আটটি প্রতিষ্ঠান এক একটি ৫ ঘর বিশিষ্ট গৃহ অথবা তারও বেশি জায়গা অধিকার করে আছে। এরা মোট গৃহস্থালীর অবশিষ্ট শতকরা তিন অংশ।

## অক্ষর জ্ঞান

শিক্ষিত ও অক্ষর জ্ঞানীদের সংখ্যা হলো ৩৯৭৫ অর্থাৎ শতকরা ৪৯ জন লিখতে পড়তে পারে। পুরুষদের শতকরা ৫৯ জন ও স্ত্রীদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন লিখতে পড়তে পারে। শিক্ষিত জনসংখ্যার রূপটা মোটামুটি এই রকম :—গ্র্যাজুয়েট ১২৯ জন, বি টি. ডিগ্রীধারী ২৪ জন, এ্যাগ্রিকালচারাল

গ্রাজুয়েট ১৬ জন, মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ৩, ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েট ৩। এছাড়া ১৯০ জনের কোন না কোন বিষয়ের ডিপ্লোমা আছে। ১৮১৩ জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

## কার্যরত জনসংখ্যা

২০৯২ জন অর্থাৎ শতকরা ২৬ জনের ভাল রকম কাজ আছে। এর মধ্যে শতকরা ৫১ জন চাকরী করে। শতকরা ১৬ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানে, শতকরা ১০ জন ব্যবসাবাণিজ্য, ৮ জন কৃষি বিদ্যায় ও বাকী শতকরা ১৫ জন অন্যান্য কাজে নিযুক্ত আছে। কর্মীদের মধ্যে ৩৩ জন যারা লোক খাটায়, ৮৯১ জন নিজেরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৬৮ জন অন্যের চাকুরী করে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হলো চাকুরীজীবি। ১৯৫১ সালের কার্যরত লোকসংখ্যা ছিল ১৫৪৮, ১৯৬১ সালের ২০৯২—বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৫। কর্মীসংখ্যার বেশির ভাগ ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত ও চাকুরীজীবি।

## কর্মহীন জনসংখ্যা

কর্মহীনদের মধ্যে ২২৬৬ জন ছাত্র বা স্কুলগামী শিশু। ১৫৭৮ জন ঘর সংসারের কাজকর্ম করে। ২০০৩ জন পরনির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই ছোট ছেলেমেয়ে এবং এরা স্কুলে যায় না। মাত্র ৪১ জন চাকুরী করতে রাজী, কিন্তু চাকুরী পায়নি। এরও মধ্যে ২৬ জন কাজ করছিলো—কিন্তু সেন্সাসের সময় তাদের কাজ ছিল না। এই ৪১ জনের মধ্যে ২৬ জন হলো নিরক্ষর অথবা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ১০ জন ম্যাট্রিক অবধি পড়েছে, ২ জন ডিপ্লোমাধারী, আর ৩ জন বি.এ. পাশ।

### পরিশিষ্ট—১

| | | M | F | T |
|---|---|---|---|---|
| ১। | মোট জনসংখ্যা | ৪,৬২৭ | ৩,৪১৫ | ৮,০৪২ |
| ২। | কর্মী | ১,৯৬৫ | ১২৭ | ২,০৯২ |
| ৩। | অক্ষর পরিচয়যুক্ত ও শিক্ষিত | ২,৭৩৪ | ১,২৪১ | ৩,৯৭৫ |
| ৪। | শিডিউল কাস্ট ও ট্রাইব | ৩০৭ | ৩০১ | ৬০৮ |
| ৫। | কর্মী—শতাংশ | ৪২.৫ | ৩.৭ | ২৬.০ |
| ৬। | অক্ষরযুক্ত—শতাংশ | ৫৯.৯ | ৩৬.৩ | ৪৯.৪ |
| ৭। | শিডিউল কাস্ট ও ট্রাইব শতাংশ | ৬.৭ | ৮.৮ | ৭.৬ |

## পরিশিষ্ট—২

### জনসংখ্যার বয়স বিভাগ

| আয়ুশ্রেণী | শ্রমিক | | | অশ্রমিক | | | মোট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | M (২) | F (৩) | T (৪) | M (৫) | F (৬) | T (৭) | M (৮) | F (৯) | T (১০) |
| ০—১৪ | ১৯ | ১ | ২০ | ১,৬৭২ | ১,৫৬১ | ৩,২৩৩ | ১,৬৯১ | ১,৫৬২ | ৩,২৫৩ |
| ১৫—২৯ | ৭৬৫ | ৫৩ | ৮১৮ | ৮৮৩ | ৮৩১ | ১,৭১৪ | ১,৬৪৮ | ৮৮৪ | ২,৫৩২ |
| ৩০—৪৪ | ৭১৮ | ৪৯ | ৭৬৭ | ১৬ | ৫১২ | ৫২৮ | ৭৩৪ | ৫৬১ | ১,২৯৫ |
| ৪৫—৫৯ | ৩৪৭ | ১৯ | ৩৬৬ | ২৫ | ২৩৯ | ২৬৪ | ৩৭২ | ২৫৮ | ৬৩০ |
| ৬০ এবং অধিক | ১১৬ | ৫ | ১২১ | ৬৬ | ১৪৫ | ২১১ | ১৮২ | ১৫০ | ৩৩২ |
| মোট— | ১,৯৬৫ | ১২৭ | ২,০৯২ | ২,৬৬২ | ৩,২৮৮ | ৫,৯৫০ | ৪,৬২৭ | ৩,৪১৫ | ৮,০৪২ |

## পরিশিষ্ট—৩

### শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ

| কার্য স্বরূপ | মনিব | চাকর | নিজহিসাব শ্রমিক | মোট | শতকরা পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১। কৃষি ও তদজাতীয় পেশা | ... | ২৫ | ১৩৯ | ১৬৪ | ৮ |
| ২। শিল্প | ১৪ | ২৫০ | ৩৪২ | ৬০৬ | ২৯ |
| ৩। গঠনমূলক কাজ | ১ | ২৬ | ৮০ | ১০৭ | ৫ |
| ৪। বিদ্যুৎ, জল ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ | ... | ৬০ | ১৬ | ৭৬ | ৪ |
| ৫। ব্যবসা ও বাণিজ্য | ১০ | ২০ | ১৯৬ | ২২৬ | ১০ |
| ৬। ট্রান্সপোর্ট, স্টোর ও কমিউনিকেশন | ... | ৩৫ | ৪৩ | ৭৮ | ৪ |
| ৭। চাকুরী | ৮ | ৭৫২ | ৭৫ | ৮৩৫ | ৪০ |
| মোট | ৩৩ | ১,১৬৮ | ৮৯১ | ২,০৯২ | ১০০ |

## পরিশিষ্ট—৪

### ১৯৫১ ও ৫৯ সালের শ্রমিক সংখ্যা

| শ্রমিক স্বরূপ | ১৯৫১ জন গণনা | ১৯৬১ জন গণনা |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। কৃষি ও তদজাতীয় | ১১৭ | ১৬৪ |
| ২। শিল্প | ৭২৫ | ৬০৬ |
| ৩। গঠনমূলক | ৯৩ | ১০৭ |
| ৪। বিদ্যুৎ, জল ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ | ২৭ | ৭৬ |
| ৫। ব্যবসা ও বাণিজ্য | ১০৪ | ২২৬ |
| ৬। ট্রান্সপোর্ট, স্টোর ও কমিউনিকেশন | ৩১ | ৭৮ |
| ৭। চাকুরী | ৪৫১ | ৮৩৫ |
| মোট | ১,৫৪৮ | ২,০৯২ |

## পরিশিষ্ট—৫

### যাঁরা কাজ করেন না তাঁরা কি কি করেন

| কার্য প্রকার | মোট | শতকরা পরিমাণ |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। স্কুলগামী শিশু ও ছাত্র | ২,২৬৬ | ৩৮·১ |
| ২। গৃহস্থালী | ১,৫৭৮ | ২৬·৫ |
| ৩। পরনির্ভরশীল অল্পবয়স্ক শিশু ( যারা স্কুলে যায় না ) ও অক্ষম | ২,০০৩ | ৩৩·৭ |
| ৪। অবসরপ্রাপ্ত আর চাকরী পাননি, ভাড়ার উপরে নির্ভর, কৃষি বা অন্যান্য সম্পত্তি থেকে বাঁধা রোজগার আসে এমনি, ও কাজ না করলেও চলে (রোজগার আছে) সেই ধরনের | ৫৫ | ০·৯ |
| ৫। ভিক্ষুক, নিঃস্ব, স্বাধীন স্ত্রীলোক অথচ কি ভাবে রোজগার আসে তা জানা নেই ও অন্যান্য ( যাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই ) | ৬ | ০.১ |
| ৬। পাগলা গারদ ও আইন কর্তৃক অভিযুক্ত বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানবাসী | ১ | ০·০ |
| ৭। প্রথম কাজে লেগেছে যারা | ১৫ | ০·৩ |
| ৮। আগে কাজ করতো এখন বেকার | ২৬ | ০·৪ |
| মোট জনসংখ্যা ( কর্মহীন ) | ৫,৯৫০ | ১০০·০ |

# পরিশিষ্ট—৬

## শ্রমিক ও বেকারের শিক্ষা মানের শ্রেণী-বিভেদ

| | শিক্ষার মান<br>(১) | শ্রমিক<br>(২) | অশ্রমিক<br>(৩) | মোট<br>(৪) |
|---|---|---|---|---|
| ১। | নিরক্ষর | ৭৮১ | ৩,২৮৬ | ৪,০৬৭ |
| ২। | অক্ষরযুক্ত (তারপর লেখাপড়া করেনি) | ১৪৮ | ৬৭৪ | ৮২২ |
| ৩। | প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী | ৬৬২ | ১,১৫১ | ১,৮১৩ |
| ৪। | ম্যাট্রিক ও উচ্চ সেকেণ্ডারী | ২৭৪ | ৬৯৬ | ৯৭০ |
| ৫। | ননটেকনিক্যাল ডিপ্লোমা (ডিগ্রীর মান নহে) | ৬২ | ১২৪ | ১৮৬ |
| ৬। | বি, এ ও তদূর্ধ ডিগ্রী (নন-টেকনিক্যাল) | ১১৪ | ১৫ | ১২৯ |
| ৭। | ভেটেরিনারী ও ডেয়ারী | ২ | — | ২ |
| ৮। | শিক্ষণ বিষয়ক শিক্ষিত | ২১ | ৩ | ২৪ |
| ৯। | ননটেকনিক্যাল ডিগ্রী থেকে কম | ৪ | — | ৪ |
| ১০। | এঞ্জিনিয়ারীং পাশ | ৩ | — | ৩ |
| ১১। | ডাক্তারী পাশ | ৩ | — | ৩ |
| ১২। | কৃষিবিষয়ক শিক্ষিত | ১৬ | — | ১৬ |
| ১৩। | অন্যান্য | ২ | ১ | ৩ |
| | মোট | ২,০৯২ | ৫,৯৫০ | ৮,০৪২ |

## পরিশিষ্ট—৭

### ১৫ বৎসর ও ১৫ বছরের বেশি বয়সের বেকারদের শিক্ষা বিষয়ক শ্রেণীবিভাগ

| শিক্ষা স্তর (১) | (২) | (৩) | (৪) |
|---|---|---|---|
| ১। নিরক্ষর | ৪ | ৪ | ৮ |
| ২। প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী | ৬ | ১২ | ১৮ |
| ৩। ম্যাট্রিক ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী | ৪ | ৬ | ১০ |
| ৪। ননটেকনিকাল ডিপ্লোমা ( ডিগ্রি নহে ) | ১ | ১ | ২ |
| ৫। বি এ ও তদূর্ধ ডিগ্রীধারী (ননটেকনিকাল) | — | ৩ | ৩ |
| মোট | ১৫ | ২৬ | ৪১ |

## পরিশিষ্ট—৮

### বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের হিসাব

| | ১৯৫১ | ১৯৬১ |
|---|---|---|
| মোট বরাদ্দ শক্তি | ৩৫০ KW | ৬০০ KW |
| ব্যবহারের জন্যে বরাদ্দ | ১৩৫ KW | ২৬৫ KW |
| ব্যবহৃত শক্তি | ২৪৪ হাজার KW | ৫৬১ হাজার KW |

# পরিশিষ্ট—৯

## পলিটেকনিকাল এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যসূচি

### ব্যবসায় তালিকা

| ক্রম সংখ্যা | ব্যবসায় | অনুমোদিত ১৯৫১ | স্থান সংখ্যা ১৯৬১ |
|---|---|---|---|
| ১। | ওভারসীয়র সিভিল | ২০ | ৩৬০ |
| | ইলেক্ট্রীকাল | ২০ | ১৮০ |
| | মেকানীকাল | ২০ | ১৮০ |
| ২। | কামার | ২০ | ৬ |
| ৩। | ড্রাফটসম্যান ( মেকানিকাল ) | ১৫ | ৩০ |
| ৪। | „ ( সিভিল ) | ... | ৮০ |
| ৫। | ইলেক্ট্রীশিয়ান | ১৫ | ৮ |
| ৬। | ফিটার | ৩০ | ... |
| ৭। | মেকানিস্টস | ... | ১২ |
| | ঐ টার্নার | ২০ | ... |
| ৮। | মোল্ডার | ২০ | ... |
| ৯। | মেকানিক ( ট্রাক্টার ) | ... | ৬ |
| ১০। | মেকানকি ( ইণ্টারনাল কমবাস্থান এঞ্জিন ) | ... | ৬ |
| ১১। | রেডিও মেরামতকারী | ... | ৮ |
| ১২। | সীটমেটাল শ্রমিক | ৩০ | ... |
| ১৩। | ছাপাখানার ঐ | ২০ | ৬ |
| ১৪। | হাতে কম্পোজকারী ও প্রুফ রীডার | ... | ১২ |
| ১৫। | ছুতোর | ৬০ | ৬ |
| ১৬। | মোটর মেকানিক | ৩০ | ... |
| ১৭। | সাধারণ মেকানিক | ... | ৮ |
| ১৮। | ফাউণ্ড্রী | ... | ৮ |
| | মোট | ৩২০ | ৯১৬ |

# নিলোখেরির আর্থিক খতিয়ান—৩১শে মার্চ, ১৯৬১ তারিখে

## সৃষ্টসম্পদ

| উপনগরীর জন্য খরচা হয়েছে ৮৮,৩২,৭২৭ | | আদায়ীকৃত অর্থ | | অবিক্রীত সম্পদ | | বিক্রীত সম্পদ ( কিন্তু অর্থ আদায় হয়নি ) | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খুটিনাটি | টাকা | খুটিনাটি | টাকা | খুটিনাটি | টাকা | খুটিনাটি | টাকা | |
| ১। খরচ<br>(ক) বাস্তু ঘরবাড়ি<br>(খ) বারোয়ারী গৃহ ও দোকানঘর<br>(গ) কারখানা গৃহ | <br>১৮,৫৫,৭৪০<br>৩,৬৮,৪৯২<br>৫,৩১,৪৬১<br>২৭,৯৫,৬৯৩ | ১। আদায়—'৬৬-ইত্যাদি বাবদ জমা | ৩৬,৮১,৭০৬ | ১। বাড়ি, দোকান বারোয়ারী বাড়ি ও কারখানা গৃহ ইত্যাদির মূল্য | ৯,০০,২৪৪ | ১। খাদি গ্রামকে বিক্রী করা জমির মূল্য | ১১,০০০ | |
| ২। উপনগরী গঠন ও কৃষি জমি বাবদ খরচ | ১০,৩৪,১৬৮ | ২। আদায়—"১৮-মূলধন বাদ আদায় ও আয়" বাবদ জমা | ৪,৪৮,২৭৩ | ২। উপনগরী ভুক্ত অথচ অবিক্রীত জমির মূল্য | ৭,৫১,৩৮৫ | ২। কৃষিজীবীদের কাছে বিক্রীত জমির মূল্য ( এ টাকাটা ৭ বছরের কিস্তিতে সুদসমেত আদায় হবে ) | ১,৬২,৭১৮ | |
| ৩। জমির মূল্য | ১,৬৬,৯৮২ | ৩। আদায়—উদ্বাস্তুদের জন্য কৃত সরকারী সম্পদ বাবদ কমপেনসেশন ভাড়া ও ঋণ বাবদ প্রাপ্ত ( এ, জি, | | ৩। অবিক্রীত কৃষি জমির মূল্য | ৯৯,০০০ | ৩। ২৫ বছরের কিস্তিতে বিক্রীত বাড়ির কিস্তি আদায় বাবদ বাকী ( ১৬ বছর ৪ মাসের কিস্তি বাকী ) | ৮,০৩,৮৬৬ | |
| ৪। সরকারী এঞ্জিনিয়ারীং কারখানার জন্য খরচ | ২,৪৭,০৮৭ | | | ৪। শিল্প কারখানার সম্পদ মূল্য | ৩,০০,০০০ | | | |
| ৫। শিল্প ঋণ | ৭,৭০,৮১৮ | | | | | | | |
| ৬। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিকে সাহায্য | ১,৬৬,৮০০ | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭। পুনর্বাসন দপ্তর কর্তৃক মজুরীকৃত নতুন গঠনমূলক কাজের জন্য (যথা, নতুন মণ্ডী, গোল তলাও, দোকানঘর, রাস্তার উপরের নালা, জলসরবরাহের বন্দোবস্ত, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরির জন্য) খরচ ৫,৯৭,৭১৮ | সিমলা, পাঞ্জাব থেকে পাওনা ) ৩,৩৫,০৯৯ | | ৪। ৭ বছরের কিস্তি বন্দীতে বিক্রীত বাড়ি বাবদ বাকী ৩,৬৮,২০০ | |
| ৮। বাড়ি ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৪.৯৮,৪০২ | ৪। আদায়— এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ বাবদ ( প্রফিট ডেপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড ও সুদ ইত্যাদি ) ২,৯৬,৫০০ | | ৫। পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টকে প্রদত্ত পাওয়ার হাউস বাবদ ১,২৭,০০০ | |
| ৯। সরকারী শিল্প কারখানা শাসন পরিচালনা, কৃষিজীবীদের দেওয়া ঋণ, ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রি বাবদ ক্ষতি—এই সব খরচ। ২৫,৫৫,০৫৯ | ৫। গোল তালাওয়ের দোকান বাবদ আদায় ১,৮৭,০০০ | | ৬। শিল্প ঋণ ৪,৯৭,১৯৩ | |
| | | | | টাকা— |
| মোট— ৮৮,৩২,৭২৭ | ৪৯,৪৮,৫৭৮ | ২০,৫০,৬২৯ | ১৯,৬৯,৯৭৭ | ৮৯,৬৯,১৮৪ |

## এক চাষীর ছেলে কর্তৃক বিরচিত "নিলোখেরি" নামক পুস্তিকা (ইং) হইতে উদ্ধৃতি (১৫ই আগস্ট ১৯৫১)

নিলোখেরির পাশেই হ'লো পুরাতন নিলোখেরি নামক গ্রামটি। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুদের যে জমি দেওয়া হ'য়েছিল—অর্থাৎ যে জমি মুসলীম দেশত্যাগীরা ত্যাগ করে গিয়েছিলো এখানকার বাসিন্দারা এখনও সেখানেই চাষের কাজ করছে। ছেঁড়া কাপড় এদের সম্বল, এদের শিশুরা রিকেট ও খাদ্যাভাব থেকেই যে সব রোগের উৎপত্তি সেই সব রোগেই ভোগে। নিস্তব্ধতার মধ্যেই কিন্তু উদ্বাস্তু দ্বীপটি তার বর্তমান নিস্তব্ধ রূপটি গ্রহণ করেছে—উপনগরীটি যেন একটি গ্রাম—আর গ্রামটি যেন একটি উপনগরী। একে অবলম্বন করে চারিদিকের বাসিন্দা জনসাধারণের জীবনের গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একই দিকে দালালের শহর দোকানদার, মহাজন, পুলিশ, উকীল, ম্যাজিস্ট্রেট আর রাজস্ব আদায়কারীর শহর, সেই একই দিকে এতদিন যে প্রাণগতি প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল সেই নিষ্কম্প জীবনে আজ আনতে হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরশ,—গতি তার ফিরবে, জীবন পাবে পুষ্টির সন্ধান। একটা পূর্ণ উপমহাদেশের মাঝখানে এতদিন নিলোখেরি, একটা দ্বীপের মত দাঁড়িয়েছিল—তার চারদিকে কাঁটা তারের কোন বেড়া দিয়ে তাকে সুরক্ষিত ক'রে রাখা হয়নি। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সেখানে দুহাজার বছরের পুরোণো অতীতের ভৌতিক জীবনের অবাধগতি—প্রতিবেশীর বধূ ও কন্যার প্রতি অবাধ নজর, খাদ্যে ভেজাল ওজনে ঠকানো, আর জীবনের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো নিয়ে কালোবাজারী করা এসবই এখানকার নিত্য ঘটনা। স্ব স্ব স্বাধীন রাজত্বের এরা পৃষ্ঠপোষক, আত্মকেন্দ্রিক ও শয়তানের পায়ে সব কিছু সঁপে দেবার এরা পক্ষপাতী। এরই মাত্র পঞ্চাশ গজের মধ্যে আমাদের নিলোখেরি। স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বয়ং পরিচালিত একটা তব্বররূপী জীবন গঠনই এর উদ্দেশ্য। কি প্রতিজ্ঞা নিয়েই না এই একলা ভেসে চলা দ্বীপ বিরাট সমুদ্রের মাঝে বাঁচবার জন্য আন্দোলন ক'রে চলেছে। বাঁচবে কি? অন্ততঃ এখানকার বাড়িগুলি, ক্ষেতখামার আর কারখানা শক্ত ভিতের উপর তৈরি—তারা হয়তো

বাঁচবে, কিন্তু নিলোখেরির কণ্ঠে কোন গান ধ্বনিত হবে কি?—বেদনার আর্তনাদে এই পরম প্রশ্নটির জবাব খুঁজছে নিলোখেরি।

প্ল্যানিং কমিশন যে পরিকল্পনাটি এখানে তুলে ধরেছেন তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'লো কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটানো। গ্রামীন জীবনের পুনরভ্যুত্থান না হ'লে কি সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে? কিন্তু কি করে এই পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হবে? প্রবাসী সব জমিদার, ডাক্তার, উকীল আর সরকারের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কর্মচারীরা বাসা বেঁধেছিল সর্ববাধামুক্ত শহরে। মরে যাওয়া গ্রামজীবনের প্রতি দরদে উপচে পড়ে তাদের বড় বড় দীর্ঘশ্বাস। এদের দিয়ে পুনরুত্থান হবে কি? হাম জ্বরের রুগীর কাছে না গেলে হাম হয় না, যেমন ঠিক, এর উল্টোটাও তেমনি ঠিক। এক নতুন জীবন গঠনের দিকে পথ প্রদর্শকের মত এগিয়ে যাবার কথা ছিল নিলোখেরির। ভরসা ছিল যে সে প্রাণশক্তিকে বাঁচানো যাবে আর তারই সংগে বাঁচবে ভারতবর্ষ, যজ্ঞের অগ্নিতে পূত হ'য়ে ধন্য হবে এই অগ্রগমনের পথ। আজও চলেছে সেই সাধনা। নিলোখেরি একটা পূর্তির নিশানা নয়, একটা সাঁকো। মঞ্জিলে পৌছাবার সে একটা পথ। একটি পথমাত্র।

GOVT. TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
Extension Services Dept.

# ॥ মৃত দেওয়াল ॥

( তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটিকা )

— চরিত্র —

রাজা
গৌতম, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের কমিশনার
কপিল—অর্থ বিভাগের কমিশনার
প্রতাপ—স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার
অজিত—খাদ্যবিভাগের কমিশনার
বিক্রম—কার্যবিভাগের কমিশনার
বান্দা—রাখাল

ঃ দৃশ্য ঃ

রাজগড়—সিন্ধুর রাজধানী।

**সূচনা—**

ইতিহাসের একটি অলিখিত পাতা খুলে গেল। ভাগ্যাঘাতে গভীর সুপ্তি থেকে জেগে উঠেছে অতীত। ঐতিহাসিককে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে 'বর্তমান', বলেছে অতীতকে জীবন্ত করে তোল। যা ঘটেছে তাকে ঘটিয়ে তোল আবার। এই অধ্যায়ের প্রধান ঘটনা হলো আক্রমণকারী হূণদের বিরুদ্ধে সিন্ধুবাসীদের প্রতিবাদ। জোর করে সিন্ধু মুল্লুককে সেদিন পদানত করেছিলো এই হূণরা। সিন্ধুদেশের নেতারা বিপ্লবের সৃষ্টি করে যারা তাদের দাস ক'রে রেখেছিলো, তাদের বাধ্য করলো রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে। চাকা ঘুরে গেল! তাদের পালানো যেন একটা নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করলো। বিজয়ী বিপ্লবীরা এসে ঢুকলো ঐতিহাসিক দুর্গে। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হলো। একটা নতুন যুগের সূচনা হলো সেদিন থেকে।

## প্রথম অঙ্ক

[ মহান রাজগড়ের দুর্গ। দুর্গের পশ্চিম প্রাকারে অস্তমিত সূর্যের ছায়া। বাইরে দৈনন্দিন কাজে ভরা জগতে নিত্য পরিচিত স্বর। দুর্গের মধ্যে একটি

বড় ঘরে গৌতম, প্রতাপ, কপিল ও অজিত—গম্ভীর তাদের মুখ, চারিদিকে ছড়ানো একটা গোল-টেবিলের উপরে অনেক কাগজপত্র ও ফাইল। আধখানা খোলা খড়খড়ি দিয়ে অস্তমিত সূর্যের আভা এসে তাদের মুখ রঞ্জিত করে তুলেছে। এই মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে, বিশেষ চিন্তায় তারা ভাবিত ও গম্ভীর। ]

প্রতাপ—( স্বরে তার গাম্ভীর্য ) আমাদের সামনে আজ সমূহ বিপদ। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। আমাদের অস্তিত্বই আজ ধ্বংস হবার পথে। এতগুলি পেট ভরাবার মত সংগতি আমাদের নেই অথচ সময় বদলেছে। এই লক্ষ লক্ষ লোককে আমরা বুভুক্ষু থাকতে দিতে পারি না, কারণ তাতে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। বন্ধুগণ, মহামারী বেড়েই চলেছে। অগণিত যে পরিকল্পনাগুলি আমরা করেছি তাতে তো কোন ফল হচ্ছে না। তারপরে বান্দাটা আবার গোলমাল শুরু ক'রেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'লো এই যে এই উদ্ধত লোকটা নিজেকে আবার ডাক্তার বলে বেড়ায়। তার উপরে রাজার এত নেক নজর !

অজিত—ঐ বান্দাটার কথা বলছেন, আমাদের ওকে সামলাতেই হবে। খাদ্যসংক্রান্ত আমাদের মূলনীতিগুলি ও তচনচ ক'রতে চায়।

গৌতম—আমারও চিন্তা কি কম। এই বান্দার ফাঁদে আমাদের রাজা পা দিয়েছেন। সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা। কি করে যেন রাজাকে ব্যাটা বুঝিয়েছে যে রক্তপাত না করে, সংগ্রাম না করে এই দেশে সে এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। দুঃখের কথা হলো ধাপ্পাবাজটার উপর রাজার এত বিশ্বাস।

কপিল—শুধু ফাঁদ বলছেন! তার চেয়ে ব্যাপারটা আরও অনেক বেশিতে দাঁড়িয়েছে। এই শয়তানের বাচ্চা বান্দাটা চারিদিকের পৃথিবীর কিছুই পরোয়া করে না। তার ভক্তরা ওরই মত খ্যাপাটে কতকগুলি লোক যারা ওকে ত্রাতা বলে সেলাম হাঁকে—তারা সবাই ওর এক্কেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে। ওর প্রতি কি তাদের অন্ধ ভক্তি! আর রাত্রি নেই, দিন নেই তারা কাজ করেই চলেছে। তার স্ব-রচিত রাজত্বে বান্দা একছত্র নরপতি। দেখে রেখো, আমি বললাম যে, ওকে যদি আমরা

বাড়তে দিই তা'হলে আমাদের সব বিদায় নিতে হবে। রাজা নিজেই হয়তো একদিন হুকুম দিয়ে বসবেন যে, আমাদের এই দুর্গটাকে একটা সাবেক বস্তুতে ভরা মিউজিয়াম করে তুলতে হবে, আর আমাদের হয়তো হল চাষ ক'রতে লেগে যেতে হবে। ঐ নাক উঁচু লোকটার মত।

প্রতাপ—এত ভয় পাবার কোন কারণই নেই বন্ধু। দাঁড়াও না একটা পথ বাৎলালাম বলে। শব্দকোষ থেকে বার করছি তিপান্ন নম্বর মার্কা মূল নীতিটা। বান্দার বিপ্লব এতেই ঠাণ্ডা করবো। রাজস্বগৃহে সংরক্ষককে হুকুম দিয়ে দেবো যেন একটা পয়সাও ওকে ধরে না দেয়। ওর প্রতিটি চাহিদা-পত্রের উপরে আমাদের সকলের মঞ্জুরী না থাকলে কিছুই দেওয়া হবে না। আর দেখতে হবে, যেন নথিপত্রগুলি চিরকাল নাগর দোলায় ঘুরতে থাকে এদিক থেকে সেদিকে। আর তাহলে আমাদের মঞ্জুরীমূলক হস্তাঙ্ক দেবার কোন প্রশ্নই উঠবে না। ওর তিমিরপুরার কাজটা রাজা মঞ্জুরী করেছেন করুন গে। ওর ধাপ্পাবাজী আমরা বন্ধ করবো। ভুলে যাচ্ছ কেন যে বান্দা একটা মেষচারক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের কথা-সমুদ্রের ধাঁধায় ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেব। ওর মেষশাবকের দল নিয়ে পালাবার পথ পাবে না তখন। বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যাবে মেষচারণ ক্ষেত্রে। বন্ধুগণ, আমার তো মনে হচ্ছে যে জয় আমাদেরই। সূর্যালোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক আমাদের অগ্রগমনের পথ।

( সাবাস, সাবাস রব উঠতে লাগলো আর তারই মধ্যে পর্দা নেমে এলো )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—নাগরদোলা ক্লাব। নাগরদোলা ক্লাবে সেদিন সন্ধ্যা। লাউঞ্জে ইভিনিং ড্রেস পরিহিত একদল পুরুষ আর হাল ফ্যাসানে সজ্জিত অনেক ঝলমলে স্ত্রীলোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু দূরে ব্রীজ টেবিলে যেন হাসির বাঁধ ভাঙ্গছে। ওদিক থেকে বেতার বাহিত গানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এদিককার হট্টগোলের স্বর। অদ্ভুত এর সংমিশ্রণ! উজ্জ্বল বাল্‌বগুলিতে চোখ ঝলসায়, মতিভ্রম হয়, মনে হয় রাত্রি বুঝি তখনও বেশি নয়। কমিশাররা সকলেই উপস্থিত। ককটেল নিয়ে বসেছেন তাঁরা। জোরে জোরে কথা বলছেন।

গৌতম—( উল্লসিত স্বর ) কালা সেপাইটাকে বাগে পেয়েছি তবে। ভাগ্য আমাদের ভাল বলতে হবে।

প্রতাপ—বান্দা কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে হাজির। আমি বললাম, তার হ'য়ে আমি কপিলকে বলবো। তাকে অবশ্যই এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছি যে তিমিরপুরার পাগলামী ছেড়ে আমাদের দলে আসতে চায়, জাতে উঠতে চায় যদি আমরা তাতে খুবই রাজী। বান্দা অবশ্য, যেমনি তার স্বভাব, জবাবটা এড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে ব্যাটা ঠিক হ'য়ে গেছে,—মচকালো বলে।

বিক্রম—যাক বাবা মন থেকে যেন একটা বোঝা নামলো। কি হে অজিত ভায়া, একটু গিমলেট চলুক। ( মদের গ্লাসে চুমুক দিল অজিত, গৌতম ও কপিল। আর বিক্রম গুনগুনানি শুরু করলো "You are my sunshine"—প্রথম প্রথম শুরুটা তার ছিল waltz-এর মতো, ক্রমে হ'য়ে উঠলো jazz ; ওদিকে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে ব্রীজ টেবিল। )

( পর্দা নেমে এলো )

## ৩য় অঙ্ক

স্থান—রাজকক্ষ। ঘরটায় সাজসজ্জা জাঁকজমকের ছাপ কম। ঘরের মধ্যে একটি বৃহদাকার ডেস্ক ও মোটামোটা কতকগুলি চেয়ার ওক কাঠের তৈরি। ডানদিকে একটা বইএর স্ট্যাণ্ড আর তাতে অনেক বই রয়েছে। রাজা বসেছেন ডেস্কের সামনে। ঢাকনি দেওয়া আলো থেকে জ্যোতি বেরিয়ে চারিদিকে যেন একটা মায়ার সৃষ্টি করেছে। তার গভীর ও উজ্জ্বল চোখের উপরে সেই আলো পড়েছে। মনে হয় আলোভরা দৃষ্টি অন্যমনস্কভাবে একটা কাগজের উপর সে যেন হিজিগিজি কাটছে।

[ অনুচরের প্রবেশ—তার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। ]

রাজা—ডাক তাকে। ( একটি শীর্ণকায় ও মলিন চেহারা অল্প বয়স্ক যুবক ঢুকলো। এর চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। শুধু চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল ও মর্মভেদী দৃষ্টি। পরিষ্কার মুখচ্ছবি, আর দৃঢ়তা ভরা চোয়াল। যে পোষাকটা পরেছে তাতে একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার হাঁটু অবধি ধুলোয় ভরা। আগোছালো পোষাক দেখে মনে হয়

এসব দিকে দৃষ্টি কম। চোখ দেখে মনে হয় লোকটা হতাশ হ'য়ে পড়েছে, তবু সে হতাশ না মানাবার জন্য সে প্রস্তুত। তাকে দেখে রাজা মৃদুহাস্য করলেন।)

রাজা—কি বান্দা, হঠাৎ কি মনে করে?

বান্দা—( উত্তেজিত ভাবে ) প্রভু আমি সে জবাব খুঁজে পেয়েছি।

রাজা—শান্ত হও। এত উত্তেজিত হয়েছো কেন?

বান্দা—যারা চিন্তাশীল শান্ত তাঁরা হবেন। যারা কর্মী তারা নিচ্ছিদ্র কর্ম ও অশান্তিতে লিপ্ত। আমার প্রায় বুদ্ধি বিভ্রান্তি ঘটেছে, কারণ জবাবটা পেয়েছি তবু মনে হয় যেন হারাবো তাকে।

রাজা—তার মানে জবাব তুমি খুঁজে পাও নি।

বান্দা—পেয়েছি প্রভু। কিন্তু আমার আর সেই জবাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মৃত দেওয়াল। সে দেওয়াল চূর্ণ ক'রতে আমি পারি কিন্তু আপনার তা মনোনীত হবে না। কারণ এই দেওয়ালের ধ্বংসের সঙ্গে অনেক মঙ্গল চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

রাজা—তবে আমি কি করি তুমি চাও?

বান্দা—আমাকে একটু ছোট্ট বেরোবার জায়গা করে দিন। যেন আমি বেরিয়ে যেতে পারি। একটা ভীষণ সঙ্কটের মুখে এগিয়ে চলেছি আমি। সামনে আমার মৃত দেওয়াল।

রাজা—কি বললে সঙ্কট? যত বাজে কথা।

বান্দা—আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এ সঙ্কট আছে। এ জাগ্রত সত্য। যদি একে অস্বীকার করি তাহলে আমাদের আদর্শের সমূহ বিপদ ঘটবে।

রাজা—পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর। একটু পরেই তোমার ডাক পড়বে।

( বান্দার প্রস্থান )

( রাজা বেল বাজালেন, অনুচর এসে রাজার হাত থেকে এক খণ্ড কাগজ নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। বিভিন্ন বিভাগের কমিশারদের প্রবেশ। রাজার টেবিলের চারদিকে সোজা হ'য়ে তারা দাঁড়িয়ে )

রাজা—( স্বরে তার রাগ রাগ ভাব ) তিমিরপুরার কাজ বন্ধ করে দিয়েছো কেন? এর অর্থ কি?

প্রতাপ—হুজুর! এই বান্দাটা হুজুর আমাদের মূলমন্ত্রগুলি মানে না। ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করেছে সেখানে।

রাজা—সব বাজে আর হিজিবিজি কথা। তোমার মূলমন্ত্র চুলোয় যাক্। দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। লোকেদের যন্ত্রণার শেষ নেই। আর তোমার মুখে সেই এক কথা মূলমন্ত্র, মূলমন্ত্র। সে মন্ত্রের আসল মূল্যের অর্থ বোঝ।

কপিল—লোকটা কমিউনিস্ট হুজুর।

রাজা—( ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন ) চুপ কর। কমিউনিস্টকে আমি যা করি করতে দাও। তোমরা কেন বান্দার কাজে বাগড়া দিচ্ছ ?

গৌতম—ও যা চায় তা যদি ওকে ক'রতে দেওয়া হয় হুজুর, তাহলে রাজ্যে ঘোর দুর্বিপাক ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা আর চারিদিকের পুরো কাঠামোটাই ভঙ্গুর হ'য়ে যাবে। এ রাজ্যের কাঠামোর কঠিন ভিত হূণ রাজারাই পত্তন করে গেছেন। তারই জোরে এ রাজত্ব চলছে। বান্দা সেই ভিত্তির আসল মূলে আঘাত হানতে চায়। এতে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ধ্বংস হবে হুজুর। জোর করে বলছি হুজুর, আমাদের অবিশ্বাস করবেন না।

রাজা—আবার যত বাজে কথা। হূণরাজ গেছে—চিরতরে গেছে! আজ আমরা যা চাই সেটা হলো জনতার রাজত্ব। জনগণের জন্যই রাজত্ব, এই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সিন্ধুস্থান আজ যে অজ্ঞানতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এ থেকে তাকে উদ্ধার করবো আমার এ প্রতিজ্ঞা অনড়। জনগণদের এ আশ্বাস আমি দিয়েছি। আর সে সত্য আমি পালন করবোই। আমার কর্মভারের গুরুত্ব তোমাদের বুঝতে হবে। আর তোমাদের পূর্ণতম সাহায্য দু'হাত উজাড় করে দাও তোমরা, তাই চাই। তা না হ'লে যে দেওয়ালে তোমরা বসেছো, তোমাদের আর সে দেওয়ালকে চূর্ণ করে দিতে তোমরা আমাকে বাধ্য করবে।

কপিল—( কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ) আমাদের প্রার্থনা শুনুন হুজুর, আমাদের অবস্থাটা বুঝুন। আমরা আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য। আমাদের সমস্ত দেহমন দিয়ে আপনার মহাসত্য অনুধাবনের কাজে সর্বশ্রম ব্যয় করতে আমরা প্রস্তুত। হূণদের আদেশ যেমন আমরা এককালে শুনেছি তেমনি আজ আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী। আমাদের সন্দেহ করবেন

না হুজুর। আইন যে করা হয় তার একটা উদ্দেশ্য আছে। ঔদ্ধত্য, অকর্ম সব রোধ করার জন্যই আইনের সৃষ্টি। গীতা বলেছেন "ত্বয়া হৃষিকেষ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সেই মন্ত্রের আমরা মন্ত্র শিষ্যমাত্র।

প্রতাপ—( গম্ভীর স্বরে ) হুজুর, আমরা যা বলছি সেইটাই একমাত্র ঠিক পথ। হূণদের সময় আমরা কাজ করেছি। দেশে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, তার জন্য নিজেদের লোকেদের সঙ্গেও আমাদের কত না ভুল বোঝাবুঝি হ'য়েছে। হূণরাজের আদেশে যে আপনি আজ আমাদের নিত্য জীবনের প্রভাত প্রার্থনারূপী সেই তাঁকেও আমরা কারাগারে বদ্ধ করতে দ্বিধা করিনি। ঠিক তেমনি আপনাকেও আজ আমরা মানবো। মুস্কিল হ'লো এই যে একটা যেন গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেছি। আজ সে ধাঁধাঁর থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছি না। আমাদের কাজই হ'লো চোখ বুজে ভালমন্দ না দেখে আইনের ছন্দ অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া। আমাদের চেয়ারে বদ্ধ হ'য়ে শব্দাবলীর সঙ্গে চির সংগ্রামে আজ আমরা জীর্ণ। আমরা ক্লান্ত, আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার নেই। আপনার অনুগত বান্দাদের উপর দয়া রাখবেন হুজুর। ( রাজার ক্লান্ত ইঙ্গিতে সকলে সভা ভঙ্গ করে বের হ'য়ে গেলেন। ) [ অল্প আলোয় ঘরটায় ছায়াছায়া ভাব। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলেছে শুধু রাজার পদচারণা। তাঁর সুন্দর মুখশ্রী কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছে। স্বগতোক্তি ক'রছেন তিনি—"কি কঠিন বিপদেই পড়েছি, কি করি না করি ভেবে পাই না।" বান্দাকে ডেকে পাঠালেন। দ্রুতগতিতে বদ্ধপরিকর বান্দার প্রবেশ। ]

রাজা—বান্দা, কি তোমার উত্তর।

বান্দা—( উত্তেজনায় বিগলিত ) প্রভু, তিমিরপুরা যেমন ভাবে বেড়ে উঠেছে তিমিরপুরা আজও তেমনি রয়েছে। ( রাজা সোজাসুজি বান্দার চোখের দিকে তাকালেন। বান্দা আনত হ'য়ে কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল। )

( পর্দা নেমে এলো )

১৯৫০-২২শে ফেব্রুয়ারী কুরুক্ষেত্রে ফারমারসন কর্তৃক লিখিত এই নাটিকাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

## লেখকের অন্য একটা বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি

সূর্যের একটা টুকরো তার থেকে পৃথিবীর শুরু। জলন্তপিণ্ডটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। তার সমতল ভাগের উপরে জীবন শুরু হ'লো। পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি এ জীবন। মাটি, জল, সূর্য, বায়ু আর আকাশ এরই থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করা হয়। জীবনের স্ফুলিঙ্গ এই পঞ্চভূতকে একত্রিত ক'রে রাখে। যখন স্ফুলিঙ্গ শেষ হয়, এই পঞ্চভূত যে ফোয়ারা ধারা থেকে প্রবাহিত হয়েছিল তারই মাঝে পুনরায় মিশে যায় খণ্ড খণ্ড হ'য়ে। তখন পিণ্ডটা আর থাকে না। দেখে সবরকমে মনে হয় যে জীবন শেষ হয়ে গেল। জীবন নামক স্ফুলিঙ্গটি এমনিভাবে সে বস্তুর জোগান দিয়ে অগণিতপ্রশ্নের উদ্ভব করে।

মানুষের শক্তি পার্থিব সুখ সন্ধানে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে জয় করার জন্য চিরতরে চেষ্টা করে চলে, তার ধারণা বুঝি যে প্রাকৃতিক শক্তি তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে উদ্যত। গুহা থেকে কৃষকের চাষবাড়ি, সবুজ কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রাসাদ, আর প্রাসাদ থেকে ঈথর অবধি চলে তার অভিযান। লাঙলের দাগ, বাষ্পের শোঁ শোঁ শব্দ আর অনুর বিখণ্ডিকরণ তারপর কি ? ইতিমধ্যে নষ্ট হয় শান্তি। চারিদিকেই ঘাটতি। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই এত সকলেই জানে— আর অলজ্ঘ্য ব'লে মেনে নেয়। আর এমনিটি ঘটছে আজ যখন একটা বোতাম টিপে দিলেই মানুষের যা কিছু জৈব চাহিদা তা মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ সমস্যা সমাধানের চাবি কার হাতে ?

বিধ্বস্ত জাহাজের কয়েক সহস্র যাত্রীর ঘর বাঁধবার প্রচেষ্টা হতে নিলোখেরির কাজের সূত্রপাত। বহু শতাব্দী ধরে পড়ে থাকা একটা জলা জায়গায় তার গোড়া পত্তন হয়। পেশীর দ্বারাই এ কাজ সাধিত হবে। পেশীকে শিক্ষিত করে তুললে এ কাজ করা যাবে ও এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যেতে পারে, যাতে নিলোখেরি সম্ভব হ'তে পারে। এসব অনেক আশা নিয়ে নিলোখেরির যাত্রা শুরু হ'য়েছিল। এর বাহ্যিক কাঠামোটা প্রায় তৈরি হ'য়ে এসেছে। নৌকা ডুবির যাত্রীরা প্রভুর আশীর্বাদের উপরে ছিল বিশ্বাসী আর তিনি অন্তবর্তীকালে কাজ চালানোর মত বিনিময় দ্রব্য অগ্রিম যুগিয়েছেন। যাত্রার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু এখনও সফল হয়নি। জন্ম

স্বাধীন যে তার বাঁচবার দাবি, জীবিকার জন্য কাজ পাবার দাবি, আর যার যা রোজগার সেটি বুঝে নেবার দাবি। সেই সব দাবির স্বীকৃতিপত্র বা ম্যাগনাকার্টা আজও রচিত হয়নি। তাই এ যাত্রা ভিত্তিস্বরূপ। বহুদূর-প্রসারিত পথ, তার কারণ একটা দ্বীপে আবদ্ধ হয়ে থাকা বা কূপমণ্ডপ হয়ে থাকার দিনগুলি ভালই হোক বা মন্দই হোক আজ শেষ হ'য়ে এলো। জন্ম স্বাধীন যে নিলোখেরিতে এসেছে, যদি সে বাঁচে তবে সকল মানুষেরই জন্য যে একটা নতুন পথ খোলা হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

## নিলোখেরি সমস্ত ভারতবর্ষের সামনে একটা নতুন আদর্শ তুলে ধ'রেছে (পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ সালের বক্তৃতা)

আমার ভাই ও বোনেরা,

এখানে যে সব কাজ হচ্ছিল তা দেখবার জন্য ঠিক এক বছর আগে আমি নিলোখেরিতে এসেছিলাম। আরও নতুন কাজ এখানে চলেছে আবার তাই দেখছি। নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সৃষ্টি হ'চ্ছে নতুন শিল্পের। আমি যখন প্রথম আসি তখন নিলোখেরির মাত্র ৮ মাস বয়স। আজ আপনাদের কাজ এতটা এগিয়েছে দেখে কত খুসী হয়েছি। হয়তো আপনাদের মনে আছে যে আপনারা যখন এসেছিলেন তখন এ জায়গাটা ছিল একটা জলাজঙ্গল। কঠিন পরিশ্রম ক'রেছেন আপনারা। জঙ্গল কেটে বাসস্থান সৃষ্টি করেছেন। মাত্র ১৮ থেকে ২০ মাসের কাজের এই ফল। আমি দেখেছি যে আপনারা—এখানকার অধিবাসী যাঁরা তাঁরা সব সময়ই শুধু যে কিছু না কিছু ক'রছেন বা নতুন কিছু ক'রছেন তাই নয়, সবচেয়ে খুসী হ'য়েছি এ দেখে যে কর্মহীন লোকেরা কর্মের সন্ধান পেয়েছেন এখানে। আর এখানকার সকলেই কর্মব্যস্ত। কাজে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যখন তাঁরা মেতে রয়েছেন, কাজ করে খুসী যখন তাঁদের উপচে পড়ছে, কখনও বা অভিযোগের কারণ ঘটেছে, এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁদের যে মনোভাবটি নিরন্তর ফুটে উঠেছে, গতবার আমি যখন এসেছিলাম তখন তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছিল। ভালোভাবেই দেখেছি আমি। এখানকার কর্মকর্তারা আমাকে বলেছেন যে তাঁরা নতুন

একটা কিছু করবার চেষ্টা করছেন। এতদিনে বাধাবিপত্তির জন্যে সেই মনোবৃত্তিটার কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা আজ তাই দেখতে চেয়েছি। আজ দেশে নিলোখেরির নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশেও পৌঁচেছে এর বার্তা। নিলোখেরি একটা গ্রাম মাত্র। আস্তে আস্তে ছোট্ট একটি উপনগরীর পত্তন হ'চ্ছে এখানে। তাই দিল্লী বা অন্যান্য জায়গায় যে সব বড় বড় ঘরবাড়ি দেখা যায় সেখানে সে সব কিছুই নেই। তবু বাইরের কত দৃষ্টি আজ আপনাদের উপরে এসে পড়েছে। সে কিসের সন্ধানে? আপনারা কি করেছেন, তার চেয়েও বেশি আপনারা কিভাবে কাজ করেছেন, সেই কর্মপন্থা সকলকে আজ মুগ্ধ করেছে। যে আদর্শে সকলে মিলে মাটি কাদা আর ইট নিয়ে বাড়ি তৈরির কাজে লেগে গিয়েছিলেন, অথবা বিভিন্ন শিল্পকলায় যেভাবে লোককে শিক্ষা দেওয়া হতো সেটাই এখানকার নতুনত্ব। সেই কর্মকর্তাদের সামনে প্রসারিত ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। দেশের অনধ্যুসিত অঞ্চলগুলিতে এমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বহু উপনগরীর সৃষ্টি হবে—সেখানে সকলেই একযোগে কাজ করবে। এই দেশেরই ওদিক থেকে আপনারা অনেকে উদ্বাস্তু হ'য়ে এসেছেন। এসেছেন আপনাদের মত আরও অনেকে প্রায় পঞ্চাশ, ষাট লক্ষ লোক। কি করে তাদের নিজেদের গৃহনির্মাণ কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, নতুন জীবনের উদ্দীপনা এনে দেওয়া যায় সেই সব নরনারীর মধ্যে, এইটাই আজকের প্রধান সমস্যা। যাঁরা এসেছেন তাঁদের সুখ সুবিধার কিছু কিছু বন্দোবস্ত করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সাহায্য কথাটার সত্যিকারের মানে কি তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। পঞ্চাশ ষাট লক্ষ লোকের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা কি করে করা যায় সেটাই আমাদের সমস্যা। হয়ত তাঁদের আরো কিছু দিন সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু এত বাড়ি তৈরি করার টাকা আসবে কোথা থেকে? দেশের টাকা তো বাইরের থেকে আসে না। এখানকার লোকদের উপরে করধার্য করেই সেই টাকা তুলতে হয়। এত লোককে সাহায্য ক'রতে হ'লে কত টাকার প্রয়োজন, সে টাকা আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া টাকা ব্যাপারটা কি সেটা ভেবে দেখেছেন কি? আপনাদের হাতে স্বীয় রোজগারের টাকা তো এসে জড় হ'চ্ছে, তাদিয়ে আপনারা কি করেন সেটুকু খতিয়ে দেখলেই বুঝবেন যে অর্থ একটা বিনিময়ের দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। টাকা কেউ খায় না।

দেশের সম্পদই হ'লো আসল। সম্পদ না থাকলে টাকা দিয়ে করবো কি? সেই সম্পদের সৃষ্টি হলে তবেই আমরা এগোতে পারবো। ক্ষেত খামারে যে ফসল ফলাই, আর শিল্প কারখানায় যা তৈরি হয় এই হ'লো জাতীয় সম্পদ।

আমাদের দেশটা গরিব নয়, এর অধিবাসীরা দারিদ্র্য প্রপীড়িত। বাইরের থেকে ধার করা টাকা এনে এ দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। দেশের অভ্যন্তরেই সম্পদের সৃষ্টি ক'রতে হবে। দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে কাজ ক'রতে হবে। কঠিন শ্রম যদি কোন জাতি করে, সম্পদ তার হাতের মুঠোর মধ্যে আসবেই। তবে একটা জিনিস দেখতে হবে—এই যে সম্পদের সৃষ্টি হ'বে তা যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগের বস্তু না হয়ে দাঁড়ায়। দেখতে হবে বিরাট জনতা যেন না খেয়ে না মরে। মেহনত করে যা আপনি সৃষ্টি করলেন তারই নাম সম্পদ। আপনার মেহনত আপনাকে সৃষ্টি করছে। নিলোখেরির সম্পদ তাঁর বাড়ি ঘর নয় যাঁরা নিলোখেরিকে গ'ড়েছে তাঁরাই নিলোখেরির সম্পদ। শ্রম দিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পদ আপনারই।

কুঁড়ে হয় দুরকমের। গরিব উদ্বাস্তুরা, তাঁদেরও খেতে হয় যদিও কিছুই সৃষ্টি ক'রবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। ধনীরা খায় কিন্তু খাটে না। এঁরা উভয়েই অলস—অন্যেরা খাটেন এঁরা এদের উপরে বসে খান। ষাট লক্ষ সমূলে উৎপাটিত উদ্বাস্তুদের গৃহ যোগাতে হবে, জোগাতে হবে কর্ম সংস্থা। এটাই আমাদের সামনে আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু করা আর গড়া যদি এঁদের না শেখানো যায়, নিজের পায়ে যদি এঁরা না দাঁড়াতে পারেন তাহ'লে আমাদের দেশের উপরে একটা চিরবোঝার মত এঁরা চেপে থাকবেন। এই নিলোখেরিতে এমনি কাজের জলন্ত উদাহরণ একটা দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল কেটে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি ক'রেছেন আপনারা। নিজেকে নিজেরাই সাহায্য করেছেন। এ ভারতবর্ষের সামনে একটা আদর্শ হ'য়ে থাকবে। আমাদের দেশের সম্পূর্ণ রূপটাই পাল্টে দেবে আপনাদের এই আদর্শ। আরও হাজার দুহাজার এমনি উপনগরী যদি পাই যেখানে সবাই কাজে মগ্ন, যেখানে নিজের শ্রমের দ্বারা নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করছেন সকলে দেশ সেখানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশে কঠিন পরিশ্রম ক'রতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অনেক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কুঁড়েদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। আমরা যদি কাজের

গতি কমাই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। যাঁরা কাজ করেন, আমার বিশ্বাস শুধু তাঁরাই বাঁচবেন। অলস যে, জাতির উপরে সে হবে একটা বিরাট বোঝা। আমাদের এই দেশ কোন লোকেরই ব্যক্তিগত জমিদারী নয় যে সে বসে খাবে, আর কাজ করবে না। যে কাজ করে না জাতীয় সম্পদের ক্ষুদ্রতম অংশের উপরেও ভাগ বসাবার দাবি তার নেই।

এখানকার সম্বন্ধে দে সাহেবের কাছে শুনেছি। অনেক কিছু তিনি বলেছেন, আরও বলেছেন যে নিলোখেরির কাজ একবছরের মধ্যেই পূর্ণরূপ ধারণ ক'রবে। অনেক লোকই অনেক কিছু ভাবে কিন্তু যা দেখেছি তাতে আমার মনে এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তিনি যা বলেছেন তা তিনি করবেনই। আপনাদের যা পাওনা তা আপনারাই অর্জন করে নেবেন। সরকার আপনাদের অর্থ জোগাতে পারে, কিন্তু শুধু টাকাতেই সব কিছু হবে না। কাজ হ'লো সম্পদের ধাত্রী। তাই সৃষ্টির কাজে লেগে যান। শুনেছি এখানে কলহবিবাদ কম। সরকারী কোতোয়ালকে কখনও এখানে নাক গলাতে দেওয়া হয়নি। আপনারা যে কাজে মগ্ন এ তারই প্রমাণ। অলস যারা কলহ করা তাদেরই স্বভাব।

আমাদের সামনের দায়িত্বটির আকার গুরুতর। ৩৫ কোটি লোককে এগিয়ে নিতে হবে। দরিদ্র, অনুর্বর এই দেশটাতে বসতি করতে হবে। দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। তাই বেকার সমস্যার সমাধান চাই। আর এ কাজটা দেশোদ্ধারের চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়।

ছুটি আবেদন আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। এখানে জল নেই, তাই শুনছি। জল না হলে ফসলের অসুবিধা হবে তা বুঝি। এই বিষয়ে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সতর্ক আছেন এটুকু জানি। ভাখরা ও নাঙ্গালের কাজ তো শুরু হয়ে গেছে। এতবড় জিনিস একটা গ'ড়ে তুলতে সময় লাগে, আপনারা আশা করি তা বুঝবেন।

একটা ব্যাপারের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনাদের কেন্দ্র যখন ঘুরে দেখলাম, দেখি যে যাঁরা কাজে নেমেছেন তাঁরা সকলেই পুরুষ। কাজে হাত সকলকে লাগাতে হবে। লোকসংখ্যা অর্ধেক যখন সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত, বাকী অর্ধেক যদি সে কাজে তাঁদের সঙ্গে হাত না মেলান এ দারিদ্র্য থকে দেশের তাহলে মুক্তি নেই। এ অর্ধাঙ্গ যে একেবারে অলস তা

আমার বক্তব্য নয়। এঁদের কর্তব্যে পূর্ণতম বিকাশ যদি না ঘটে তবে তাঁদের নিজেদেরও বিকাশ ঘটবেনা। নিলোখেরি কারো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই এতে সমান অধিকার আছে। তাই বোনেরা যদি হাত না লাগান তাহ'লে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

আজ আপনাদের পলিটেকনিকও দেখেছি। শিশুদের দেখে যে কি খুসী হয়েছি তা ব'লতে পারি না। ওদের ভাল দেখেছি বলে ভরসা করি যে শিক্ষা তাদের দেওয়া হচ্ছে তার পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। স্কুলটাও ভালই চলছে দেখলাম। এরা ভবিষ্যতের নাগরিক তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটার দৃষ্টিকোণ বদলাতে হবে। এদের ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে হবে। পড়তে শিখুক, লিখতে শিখুক, ভাবতে শিখুক এরা। সেইদিকে নিলোখেরির দৃষ্টি সমাহিত হোক।

আপনাদের আশীর্বাদ ক'রতে অনুরুদ্ধ হ'য়েছি। আপনাদের কর্মধারাই আপনাদের চির আশীর্বাদ। যা করেছেন, এখানে যা কিছু ঘটিয়ে তুলেছেন তারজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের। আর এও জানাচ্ছি যে মাঝে মাঝে এসে হাজির হব। —জয়হিন্দ।

## "জাতির সম্পদ নিলোখেরি"

[ ১০ই মার্চ ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হ'লো। এইদিন প্রধানমন্ত্রী নিলোখেরি পরিদর্শনে এসেছিলেন। ]

আমার ভাই ও বোনরা,

আমি প্রথম নিলোখেরিতে এসেছিলাম তার জন্মলগ্নে। তারপর দ্বিতীয়-বার যখন এলাম তখন নিলোখেরির শৈশবকাল। আজ আবার এসেছি নিলোখেরিকে দেখতে তার জাগ্রত যৌবনে। তার এই উন্মেষ ঘটেছে মাত্র তিন বছরের মধ্যে। যে স্মারকলিপি আমার কাছে এখানকার শহরতলীর অধিবাসীরা পেশ করেছেন, তার মধ্যে সরকারের অনুধাবনযোগ্য বিষয় অনেক কিছুই আছে। তবু দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে এই স্মারকলিপির বাকী অংশটা সবটা না বললেও চ'লতো। স্বাধীনতার আগে গভর্ণর বাহাদুরদের যে রকম মামুলি মানপত্র দেওয়া হ'তো, এটা অনেকটা সেই রকম শোনালো। জানি,

দেড়শো বছরের দাসত্বের ভূত তিনবছরে নামবেনা, কিন্তু আজ সময়টা এমনি পড়েছে যে সেটা ঘোচানোই দরকার।

ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছেন! সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনারা যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন, জানি তিনি যা করণীয় করবেন, এছাড়া আপনাদের অন্যান্য বক্তব্যগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর পদে আমাকে বসিয়ে আমার উপরে এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করে দিয়েছেন। যেহেতু আমি প্রধানমন্ত্রী, সেহেতু আমি আজ সমগ্র দেশের সেবক; কোন একটা বিশেষ ভূখণ্ডের প্রতি মমত্ব অহেতুক প্রদর্শন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বাড়ি হলো এলাহাবাদে। দেশের অন্যান্য জায়গার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এই এলাহাবাদের উন্নতি সাধন করার কাজে লেগে যাওয়াও যে আমার পক্ষে অশোভন হবে তা আপনারা মানবেন। এখানকার পক্ষেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। উদার হোক আমাদের দৃষ্টি, আমার দায়িত্ব সর্বজনের, তাই কূপমণ্ডুকতা পরিত্যাগ করতেই হবে।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলানো দরকার। অনেক কিছু আজ আমাদের স্বীয় চেষ্টায় ক'রে ফেলতে হবে। ভিক্ষার সময় এ নয়; বারবার চাইলেই যেটা চাই আকাশ থেকে সেটা ঝপ্ করে পড়বে না। আমরা ততখানিই পাব যতটুকু নিজেরা করে তুলতে পারি। আপনারা আজ তাই সকলে একত্রিত হয়ে দাঁড়ান। নিজেরা উৎসাহে দীক্ষিত হোন, এতে আপনারাও উঠবেন আর তার সংগে সংগে সমস্ত দেশটাও উঠে দাঁড়াবে। একটা মূলকথা আপনাদের বলি, সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন, সরকার কোন জনসমাজকে সাহায্য করতে পারে না, জনসমাজই সরকারকে সাহায্য করে থাকেন। সরকারের ক্ষণিক সামর্থ্য আছে কিন্তু সবকিছু সরকার ক'রে উঠতে পারে না। নিজেদের সামর্থ্যের দিকে না তাকিয়ে আপনারা সকলে যদি শুধু সরকারের মুখের দিকে ফিরে তাকান, সে অসম্ভব দাবি সরকারের অসহনীয় হবে। পৃথিবীর বৃহত্তম সরকারও সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট পথ দেখাতে পারে, একটা উদাহরণ স্বরূপ নিজেকে তুলে ধরতে পারে কিন্তু দেশের উত্থানের জন্য ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য দেশের লোকদের সমস্ত সামর্থ্যকে স্বশক্তিতে একত্রিত

ক'রতে হবে বিভিন্নমুখী কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে—উত্থিত হতে হবে। এর উদাহরণ তো এই নিলোখেরিতেই রয়েছে। এখানকার কাজে সরকার কিছুটা সাহায্য নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন কিন্তু এখানে যা কিছু গ'ড়েছে তা সবই এখানকার লোকদের নিজ কর্মক্ষমতার ফলে। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে এমনি একটা শহর এখানে গ'ড়ে উঠেছে যা আজ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তেমনি গ'ড়তে পারে আরও ৯৯৯৯টা নিলোখেরি আত্ম সহযোগিতার ফলে।

যে মানপত্র পেশ করেছেন তাতে দেখছি যে এখানকার চাকুরীপ্রার্থী জনসমাজ আর নিলোখেরিতে চাকুরী খুঁজে পাচ্ছেন না। এ বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমার দেশবাসীরা আজ ছায়ার সঙ্গে কুস্তিতে মেতে আছেন। এ দেখে দুঃখ হয়। তাঁরা এটুকু বুঝতে পারছেন না যে পরের গোলামী ক'রলেই জাতটা উদ্ধার হয়ে যাবে না। যাঁরা চাকুরী শিকারে ব্যস্ত দেশের সম্পদ তাঁরা নন। যাঁরা সত্যিকারের দেশসেবক তাঁরা চাকরীর পেছনে ঘোরেন না। কথাটা সহজ, এত সহজ যে বলে বোঝাতে হয় না। একতাল সম্পদ নিয়ে যদি আপনাকে বনে পাঠানো যায় তাহলে কতদিন চলবে ভাবেন? খাবেন কি? সোনা খেলে তো পেট ভরবে না। দেশে যা কিছু প্রস্তুত হয় তাই হলো দেশের সম্পদ। ধন্য সেই দেশ যেখানে দ্রব্য প্রস্তুতির সীমা অপর্যাপ্ত। তাই বলছি শুধু চাকরী সন্ধানের অবমাননাকর পথ ছেড়ে নিজেদের শক্তিকে একত্রিত করুন। তাতেই দেশের সম্পদ বাড়বে। আপনাদেরও উন্নতি হবে, দূর হবে অগণিত জনতার দুঃখ। আবার বলি, এ পথও তো নিলোখেরিই দেখিয়েছে। এই জায়গাটার প্রতি আমার এত আকর্ষণই বা কেন? নিলোখেরির বাইরে অন্যত্র গৃহসৌধের আকার বড়, জীবনের গতিও শোভনতর। তবু এ জায়গাটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হ'লো এই, নিলোখেরি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সে সহায়তা করে। তাই বলি নিলোখেরি হলো জাতির সম্পদ।

শেষ করবার আগে আর একটা কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে আজ গ'ড়বার চেয়ে ভাববার লোকের সংখ্যাই বেশি। সত্যিকারের রচয়িতার চেয়ে সমালোচকরাই দলে ভারী। তাই এমনি জায়গায় এলে, যেখানে সত্যিকারের কাজ হচ্ছে, আমি যেন নতুন জীবনীশক্তি পাই। কাজ— যে কাজের মাঝেই দেশের গঠন সম্ভব হবে, এই নিলোখেরি সেই কর্ম সংগীতে

মুখর। তাই এখানে এলে আমার এত ভাল লাগে আর আপনাদের বার বার ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করে।

## নিলোখেরির প্রতি কংগ্রেস সভাপতির বাণী

২১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে আম্বালা যাবার পথে মজদুর মঞ্জিলের দপ্তরের সামনে একটু দাঁড়িয়ে গেলেন। আর দিয়ে গেলেন নিম্নলিখিত বাণী—

নিলোখেরিতে এলে হৃদয় উৎসাহিত হয়। কারণ নিলোখেরি আজ একটা আদর্শ। এ জায়গাটার নাম শুধু এদেশেই নয়, দেশের সীমানা পার হ'য়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর ঠিক এই জন্যই—দায়িত্ব এর বিরাটতর রূপ পরিগ্রহ করলো। যেমনি নাম তেমনিটি তো হ'তে হবে তাকে।

## "কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা সংখ্যা—১৯৫৩" এতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ

এই সাময়িক পত্রটির নাম আমাদের এক বিরাট যুগ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিরাট যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে যেখানে সেই লড়াই হ'য়েছিল আজ আমাদের স্বীয় অক্ষমতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও আরও বহুবিধি বিভীষিকার বিরুদ্ধে একটা সম্পূর্ণ অন্যরকমের লড়াই শুরু হয়েছে।

আমাদের এই বিরাট দেশ ও তার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যাবে এ লড়াই আমাদের এক ভীষণ সমস্যার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তবু যারা এই বিপদে উদ্ধার করতে পারবেন সেই সহায়কদের সংখ্যাও বড় কম নয়। জনসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ আমাদের রয়েছে। যদি ঠিকমত এসব কাজে লাগাতে পারি তবে এ সমস্যার সমাধান সহজ হবে।

টাকার কথাটা আজকাল খুব শুনতে পাই। জানি, কাজ ক'রতে হলে টাকা লাগে কিন্তু যেটা আসল দরকার, ধোপে যেটা টিকবে তাহলো মানুষ। টাকা নয়, মানুষই ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। মনুষ্যত্বের বিকিরণও ঘটেছে তারই হাতে। আমাদের দেশে ঠিক মানুষ তৈরি করতে যদি আমরা পারি, তাহলে বাকি কাজটা অতীব সহজ হ'য়ে দাঁড়াবে। বিগত কয়েক বৎসরের

পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে। সে বলে মানুষ তৈরি করা যায় আর এমনি ভাবেই আমাদের পথের কাঁটা দূর হবে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র মানুষের হাতে গড়া বহু কর্মকেন্দ্র ছেয়ে আছে। প্রদীপের মত চতুর্দিকের অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে জোরে, আরও জোরে ছড়িয়ে পড়ে তাদের আলো। বাড়ুক এই আলোর ঔজ্জ্বল্য, আস্তে আস্তে ঢেকে দিক সমস্ত দেশের অন্ধকার। এমনি বহু কর্মকেন্দ্রের মধ্যে নিলোখেরি অন্যতম। দেশে ও বিদেশে এর সৌরভ আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আর ঠিক সেইজন্যই অন্যান্য কর্মকেন্দ্রগুলিকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে নিলোখেরি ও তারই মত অন্যান্য কর্মকেন্দ্রগুলির দায়িত্ব। এদেরই তো পথ দেখাতে হবে। নতুন আদর্শের সৃষ্টি করতে হবে এদেরই। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বড় কথা নয়, আজ গুণমাহাত্ম্য চাই।

আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা তাই পাঠিয়ে দিলাম সেই সব নীরব কর্মীদের কাছে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যারা নতুন দেশ গঠনে বিরাট ও দুঃসাহসিকতাময় কাজে আজ নিযুক্ত রয়েছেন।

নিউ দিল্লী
সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৫৩

জহরলাল নেহরু

## সংবাদপত্র থেকে সংক্ষিপ্ত খবর

(১) ২রা মার্চ ১৯৫০ সালে লোকসভার প্রশ্নোত্তর সময় নিলোখেরির কথা উঠেছিল। আলোচনার সময় এগিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—

এই বিষয়ে (নিলোখেরির পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ব্যাপারে) সাধারণভাবে আমার আগ্রহ আছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন নিজেরা গিয়ে এজায়গাটা দেখে আসেন,—সমস্ত ব্যাপারটা হ'লো একটা সমবায় উদ্যোগ। যা কিছু ঘটে সেখানে তা সমবায়ের ভিত্তিতেই ঘটে। পুনর্বাসনের যতকাজ আমি দেখেছি তার মধ্যে একথা মানতেই হবে এইটাই হ'লো উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শ্রীযুক্ত এস, কে, দে নামে এক ভদ্রলোক আসল বাসস্থান তাঁর সিলেটে, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, তিনি কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে কাজে লিপ্ত

আছেন। সেখানকার লোকদের বিভিন্ন ধরনের কর্মধারায় তাদের শিক্ষিত করে তোলার ভার তিনি নিয়েছেন। তাঁর কাজ দেখে আমরা এতই চমৎকৃত হ'য়েছি যে ৫০০ একর জঙ্গলাকীর্ণ জমি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হ'লো। মাত্র ১ বছর ১০ মাস আগে—নানারকমের কল্পনা মাথায় নিয়ে একটা উপনগরী তৈরি করার জন্য জায়গার সন্ধান করছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘোর জঙ্গল কেটে প্রাচুর্য পূর্ণ কর্ম ব্যস্ত একটা গোটা উপনগরীর পত্তন হ'য়ে গেল। উদ্যমশীল বহুলোক সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন সেখানে।

(২) প্রধানমন্ত্রীর আবেদন অনুযায়ী পার্লামেণ্টের ৪০ জন সদস্য ২০শে মার্চ (১৯৫০) নিলোখেরি পরিদর্শন করে এলেন। তাঁদের নিলোখেরি আগমন সম্বন্ধীয় খবর থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সর্বত্র যে প্রগাঢ় পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তারই একটি বিশেষ রূপ এই নিলোখেরি। লোহা, সিমেণ্ট, ষ্টীল ও পেট্রোলিয়াম নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের কাজে নতুন পথের সৃষ্টি ক'রেছে এই নিলোখেরি। এই সমবায়ী কার্যসংস্থার সবচেয়ে বড় কথা হ'লো এই যে যাঁরা কাজ ক'রতে রাজী নন এই উপনগরীতে তাঁদের স্থান নেই। এখানকার অধিবাসীদের নিলোখেরির কোন বিশেষ সম্পদের উপরে কোন মালিকানা স্বত্বও রাখতে দেওয়া হয় না।

পার্লামেণ্টের যে সব সদস্যরা পরিদর্শনের কাজে এসেছিলেন নিলোখেরিতে তাঁদের সবচেয়ে যা আশ্চর্য লেগেছে তা হ'লো শারীরিক শ্রমের প্রচার। টাকা ধার দেনেআলা মহাজন, দোকানদাররা পর্যন্ত যাঁরা চিরকাল সবরকমের শারীরিক শ্রমকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন তাঁরাও এই কাজে নেমে পড়েছেন। ভূতপূর্ব আইনব্যবসায়ীরা গলিত ধাতু নিয়ে ফাউণ্ড্রির কাজে লেগে গেছেন, পণ্য ব্যবসায়ীরা জুতা তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন এও দেখা গেছে। সমাজের যাঁরা কখনই উৎপন্নকারী কোন কাজে শ্রমিক হ'য়ে লেগে যেতে রাজী হবেন না সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই ছিল না। চেহারা কি করে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যায় সেই দুরূহ পথের সন্ধানও বুঝি এই নিলোখেরিতেই দেখা গেল।

পার্লামেণ্টের সদস্যরা নিলোখেরির অনেক প্রশংসাই শুনেছিলেন তবু

৫০ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে আরও ৫০ লক্ষ টাকা লাগবে কাজ শেষ হ'তে। নিলোখেরির এই উচ্চ মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের মনে বেশ খানিকটা খটকা ছিল। ঘুরে দেখে এসে কিন্তু তাঁদের মত বদলে গেছে। যে টাকা খরচ হ'য়েছে সেটা যে নষ্ট হয়নি, মূলধনের আকার পরিগ্রহ করেছে, এবিষয়ে তাঁরা যেন আজ নিশ্চিন্ত।

(৩) শ্রী এন, ডি, গ্যাডগিল ওয়ার্কস, মাইনস ও পাওয়ার মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন মন্ত্রী ১৯৫০ সালের ২রা জুন নিলোখেরিতে এসেছিলেন। তখনকার সমবায়ী উদ্যোগ পরিদর্শন করে তিনি বলেছিলেন, আজ যা দেখছি অন্য কোথাও তা দেখিনি। এরা এমন কোন গঠনমূলক কাজে হাতে দেন না, যার কোন না কোন বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক মূল্য আছে। গঠনের এই যে প্রচেষ্টা এখানে চলেছে তারই মাঝে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমাজ ও তার জনসমষ্টিকে গড়ে তোলার আদর্শরূপ নিহিত।

(৪) নিউইয়র্ক টাইমসে শ্রীযুক্ত সি, এল, সালজ্যোবার্গার নিলোখেরি সম্বন্ধে লিখেছেন। লেখাটির বিষয় হ'লো "ভারতবর্ষের গ্রামে প্রতিযোগিতা-মূলক সহাবস্থান"। ভারতবর্ষ আজ যা গ'ড়ে তোলার চেষ্টা ক'রছে, পশ্চিম পাকিস্তান হতে আগত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কেন্দ্র নিলোখেরি নামে নতুন এক গ্রাম পত্তনের মাঝে তার ক্ষুদ্ররূপ দেখা যাবে। শুরুতে এদের সংগঠিত করেছিলেন দে সাহেব। প্রথম দিন থেকেই এই প্রজেক্টের পরিচালনার ভার তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা করেছেন। চারিদিকের অনুন্নত ছোট ছোট গ্রামগুলির তুলনায় দেখতে গেলে নিলোখেরি একটি আদর্শ পুনর্বাসন কেন্দ্র।

এর প্রতিবেশী গ্রামগুলির দারিদ্র্য শোচনীয়। এই দেশে বিশেষ করে এই গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিল্প-বিপ্লবের কোন ছাপই নেই। এই আনবিক যুগেও অজ্ঞানতা, রোগ, আর অনুন্নতায় বিকালঙ্গ এর দেহ। নিলোখেরি থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে 'সমানা'র স্থানীয় কূয়োটা অতীব নোংরা। দুঃস্থ ছেলেমেয়ের দল গোবরের ঢিপির উপরে সেখানে খেলে বেড়ায়। বীভৎস দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে 'সমানা'র গৃহস্থ পরিবার।

তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে নিলোখেরি মন মাতায়। আমেরিকার থেকে দরিদ্র হ'লেও প্রতিটি বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো ও কলের জলের

সংস্থান করা হ'য়েছে। এখানকার বাসিন্দারা ৩০ বৎসর ধরে সস্তা কিস্তিতে ভাড়া জুগিয়ে যান, আর তার পরে মালিকানাস্বত্বে বাড়ির দখল লাভ করে ফেলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিদ্যালয় এখানে আছে। ছেলেমেয়েরা ব্যবহারিক বিদ্যায় পারিদর্শিতা লাভের জন্য ছুতোরের কাজ, ছাপাখানা, যন্ত্রচালনার কাজ, কমার্শিয়াল আর্ট ও তাঁতের কাজে হাত লাগাতে পারেন। গোটা দেশটার প্রতি একশ জনে ৮৫ জন নিরক্ষর। নিলোখেরিতে নিরক্ষরের সংখ্যা হলো প্রতি শ'তে মাত্র ১৫ জন।

শিক্ষক যাঁরা এই কর্ম কেন্দ্রটি গ'ড়ে তোলার জন্য একত্রিত হয়েছেন, তাঁরা ছোটদের নতুন বিদ্যা যা তারা নিজেরা সংগ্রহ করে চারিপাশের গ্রামবাসীদের মাঝে তার বিকিরণ ঘটাবার জন্য তাদের উদ্যোগী করার জন্য উৎসাহ ছড়ান। এই বিদ্যা বিকিরণের কাজ বড় সহজ নয়। প্রাক সামন্তযুগী ধ্বংসপ্রায় একটা দেশে শরীর পরিষ্কার রাখা, পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি ও পরিবার নিয়ন্ত্রণাদি নয়া তথ্যবহুল প্রচার এক বিভ্রান্তকারী দায়িত্ব বটে।

পথপ্রদর্শনকারী এইসব পরিকল্পনাগুলিকে খুব বেশিদূর নিয়ে যাবার কাজে সরকারও রাজী নন। শ্লথগতি হোক আদর্শগ্রাম ও বহুলাংশ আকীর্ণকারী প্রাণহীন অন্তরভূমির পার্থক্যটা খুব বেশি প্রকট না হ'য়ে উঠুক সরকার তাই চান। সমগ্র গ্রামদেশের পূর্ব নির্দেশিত পদক্ষেপে উন্নতি হোক এইটাই লক্ষ্য। এর গতি যেন কখনও আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়। যা চাই তাই যে তাহ'লে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। এই কর্মকর্তাদের এও জানা আছে যে, নিলোখেরিতে কৃষি উন্নয়নের জন্য তাঁরা যেসব পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন, তার চেয়ে উন্নততর কৃষি বিদ্যা মানুষের অজানা নয়। তবু সমগ্র কৃষিপ্রথাকে যান্ত্রিক রূপ দিতে এঁরা এখনও রাজী নন। কারণ কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্র এসে গেলে বহু চাষী বেকার হ'য়ে পড়বে। ভারতবর্ষের শিল্প সংস্থাগুলি যতদিন না গ'ড়ে উঠছে এই উদ্বৃত্ত যন্ত্র বিতাড়িত কৃষিকর্মীদের কর্মসংস্থান যোগানোর জন্য ততদিন তাঁরা বলেন,—ধীরে চল।

ভারতবাসীরা জানেন, এই শ্লথগতিতে তাঁরা কোন নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারবেন না। কমিউনিস্ট চীন যেখানে একনায়কতন্ত্র, জোর করে যা চায় তাই ঘটায় সেখানে যেমনটি ঘটতে পারে। একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ কিছুদিন হলো পিকিং পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট চীনের

তুলনায় যেখানে অনেক দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধন হ'চ্ছে, ভারতবর্ষের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা তার তুলনায় জন সহযোগিতা সংগ্রহে অনেক বেশি অপটুতা দেখিয়েছে, আর তাই তাদের কাজও বেশ ব্যাহত হ'য়েছে। একথা মানতে সকলেই রাজী, নিলোখেরির স্থানীয় শাসকবর্গের সদস্য থেকে আরম্ভ করে নেহেরু মন্ত্রিসভার সকলেই মানবেন যে ভারতবর্ষের গ্রামীন উন্নয়নের কাজের গতি শ্লথ হ'তে বাধ্য। এই জৈবিক অক্ষমতা মানিয়ে নিতে তাঁরা অসম্মত নন, কারণ আত্মিক লভ্যটাও ছাড়তে তাঁরা চান না। এবিষয়ে শ্রী দে বলেছেন : মানুষের জীবনে স্থায়ী উন্নতি আনতে হ'লে ক্রমবর্ধমান ভাবেও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সর্ব আঘাত থেকে বাঁচিয়েই তাকে আনতে হবে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। উপর থেকে কোন একটা পন্থা চাপিয়ে দিলে, তা যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই আসুক না কেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার বলি সেখানে ঘটবেই। যাইহোক না কেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদা আমাদের সকলের কাছে সবচেয়ে মহত্তম।

SOVA TRAINING COLLEGE
HOOGHLY
Extension Services Dept.

এস, কে, দে নামে সুপরিচিত ভারত সরকারের "কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট, পঞ্চায়েতী রাজ ও কো-অপারেশন" মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুরেন্দ্রকুমার দের জন্ম শ্রীহট্টে ১৯০৬ সালে। আমেরিকার পারডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস্‌সি ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্, এস্‌সি ডিগ্রী আহরণের পর প্রায় একটানা ১৬ বছর আমেরিকান জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর ভারতস্থিত দপ্তরে এক্সরে ও অন্যান্য ইলেকট্রো-মেডিক্যাল বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তখন তাঁর পেশা ছিল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

১৯৪৭ সালে দেশ যে দিন স্বাধীন হলো সুরেন্দ্রকুমার দে তখন এই কোম্পানীর ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল দেশের সম্মিলিত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। উচ্চপদাধিকারী কর্মী, কিন্তু হঠাৎ সব পদালঙ্কার পরিত্যাগ করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাস্তুহারা সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। শুরু হয়েছে রিক্ত হাতে অজানার পথে অভিযান। নতুন কাজের প্রথম হাতে-খড়ি কুরুক্ষেত্রে। তৈরি হলো "নিলোখেরি" নামক নাতিবৃহৎ এক কৃষি ও শিল্পমুখী জনপদ। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে সৃষ্টি হয় কম্যুনিটি প্রজেক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের এক পুরো কাঠামো এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কাজের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ভারত সরকারের এই দপ্তরের অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ হলেন এস, কে, দে। ১৯৫৬ সালে মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয় এই দপ্তর। নাম হলো মিনিষ্ট্রি অব কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট। ১৯৫৯ সালে এরই সঙ্গে মিলিত হলো সমবায় দপ্তর। পঞ্চায়েতের পুনর্গঠনের ভারও এই দপ্তরের হাতে আসে প্রায় একই সঙ্গে। সেদিন থেকে এই বিভিন্নমুখী কাজে লিপ্ত এস, কে, দে হলেন ভারত সরকারের পূর্ণপদাধিকারী মন্ত্রী। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ ল উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রথিতযশা কর্মী শ্রী দে আরো অনেক বই লিখেছেন। তার মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট বইখানির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের অন্যান্য রচনা— 'পঞ্চায়েতীরাজ,' 'কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট — এ ক্রনিক্‌ল্'।